৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা। "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।" বৈশাখ ১৩১৩।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর।

সূচী।

ডাঃ মাঃ সমেত অগ্রিম বার্ষিক …

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর, শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর, উমেশচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী, শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শ্রীপ্রতিভা সুন্দরী দেবী, শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীঃ দেবী প্রভৃতি।

পুণ্য নিয়মাবলী।

১। ...্যর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা সহরে ৩৲ এবং মফঃস্বল ডাকমাশুল সহিত ৩।৵০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

যাঁহারা এককালীন ৩৲ দিতে অসুবিধাজনক মনে করেন এক টাকা করিয়া ৩৲ পূর্ণ করিয়া দিলে আমরা লইতে প্র...

২। পুণ্য প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কেহ পুণ্য না পাইলে আমাদিগকে সেই মাসের মধ্যেই জানাইবেন নচেৎ আমরা পুনরায় পুণ্য দিতে বাধ্য থাকিব না।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।

৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

কলিকাতা : ৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, "পুণ্য যন্ত্রে"

এবাদত আলি খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও পুণ্য কার্য্যালয় হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ওঁ

নববর্ষ।

বিভাস—ধামার।

নব বরষের আজি প্রথম প্রভাত ;
গত বর্ষ মিশে গেছে অতীতের সাথ,
গেছে চলে অন্ধকার,
খুলে গেল শুভ্রদ্বার,—
দেখ ওই জ্যোতির্ম্ময় যিনি বিশ্বনাথ,
চল গিয়ে তাঁর পদে করি প্রণিপাত ;
ভক্তি-পুষ্প মালা গেঁথে
দাও তাঁর চরণেতে,
শুভদিনে লহ তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ।

জয়দেবের জয়কীর্ত্তন।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে—গ্রন্থের আদিতেই জয়দেব জয়কামনা রলেন!—মধুরমেদুর ভাবে রাধার সহিত শ্রীগোবিন্দের মিলন শোভা টিত করিয়া, ধীরে ধীরে যমুনাতীরে, শ্যামমেঘচ্ছায়ে, তমালদ্রুমপরি-শোভিত শ্যামবনভূমির মধ্যে শ্যামকে অবলোকন করিয়া সমস্ত জগতকে যেন শ্যামক্ষেত্ররূপে দর্শন করতঃ যথার্থ ভক্তের ন্যায় অন্তরের সহিত রাধা-মাধবের রহঃকেলির জয়কীর্ত্তন করিলেন। "জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।" জয়কীর্ত্তনানন্তর তিনি স্বরচিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলেন—

"বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিত চিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধং॥

"যাঁহার চিত্তসদ্ম বাগদেবতাস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতে চিত্রিত, যিনি পদ্মাবতীচরণযুগলের প্রিয় সেবক, সেই জয়দেব কবি শ্রীকৃষ্ণের রতিকেলি কথাবিষয়ে এই প্রবন্ধখানি রচনা করিতেছেন।

পাঠকগণ একবার জয়দেবের ভক্তির প্রতি দৃষ্টি করিবেন!—জয়দেব প্রবন্ধ-রচনা করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রেই রচনার মূলে সেই আদিরচয়িতার আদি রসের জয়-গান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ইহাতে জয়দেবের গীতিকবিতায় জয়চিহ্ন দেখিতে পাই।—জয়দেব ধর্ম্মপরায়ণ হরিভক্ত ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাই তিনি পরাজয়ের ধ্বনি ছাড়িয়া জয়ধ্বনিতে উৎফুল্ল হইতেন; জয়ধ্বনির আনন্দ তিনি বুঝিয়াছিলেন। জয়জয়কারধ্বনিই একরূপ আনন্দধ্বনি ব্যতীত আর কি? সম্ভবতঃ এই সংস্কৃত জয়ধ্বনি হইতেই বিদেশীয় Joy ধ্বনি [illegible] হইত; জয়োল্লাসে

তিনি বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা হইয়া উঠেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রাঙ্কনে নিপুণতা লাভ করেন; যে, যে বিষয়ে আঁকিতে চাহিবে তাহার তৎতৎ বিষয়ক চরিত আয়ত্ত করা চাই, তৎতৎ বিষয়ের ইতিহাস ইতিবৃত্ত জানা চাই নচেৎ তৎতৎ বিষয়ক চরিতাঙ্কন বড়ই কঠিন। চরিত্রচিত্রিত করাই যথার্থ চিত্রকবির ধৰ্ম্ম। ইহাতেই কবির ভাব বিকশিত হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক চিত্রের অন্যতম নাম কাব্যিক চিত্র। Sir Joshua Reynold তাঁহার চিত্রসম্পৰ্কীয় বক্তৃতায় Historical painting কে poetical painting বলিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের সে জ্ঞান ছিল, নচেৎ তিনি কখনো অমন করিয়া যেন ঈষৎ স্পৰ্দ্ধাসহকারে বলিলেন—

বাগদেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধং॥

অর্থাৎ জয়দেবের বলিবার ভাব এই, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলির জয়াশীৰ্ব্বাদ করিয়া তৎবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিতে যাইতেছেন, তাহা কি তিনি নির্বুদ্ধির মত যাইতেছেন? না, তাহা নয়, তিনি তাঁহার চিত্তগৃহটীকে বাগদেবতা-স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে চিত্রিত করিয়া তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রতিকেলি কথাসমেত প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; এবং তাহারই বলে—'বাগদেবতাচরিত চিত্রিতচিত্তসদ্মতা'র বলেই বিক্রমভরে সাহসের ভরে কহিতেছেন:—

"যদি হরিস্মরণে সরসংমনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুরকোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।

যদি হরিস্মরণে মন প্রেমে সরস হয়, যদি বিলাসশাস্ত্রপাঠে কৌতূহল থাকে তবে, মধুর, কোমল, কমনীয় পদাবলীময় জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর। কি মুক্তপ্রাণে, ভক্তের ভক্তিবলে, আনন্দোচ্ছ্বাসে—আনন্দোৎসাহে সকলকে তাঁহার মধুর, কোমল, কমনীয় পদাবলীময় বাণী শ্রবণ করিতে আহ্বান করিতেছেন! আর তাহাও আহ্বান করিতেছেন এই বলিয়া যদি হরিস্মরণে

মন প্রেমে সরস হয়, যদি বিলাসশাস্ত্রপাঠে কৌতূহল থাকে তবে, নচেৎ নয়; যেন জেতার জয়যুক্ত বিক্রমভরে সকলকে ঐরূপে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন! ইহাতে পরাজয়ময় অন্তরের নিরুৎসাহ বাণী নাই; ইহা আগ্রহময় উৎসাহমধুরবাণী! পরে পুনশ্চ আরো যেন জয়বিক্রমে কহিতেছেন :—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং;
জানীতে জয়দেবএব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরুহদ্রুতো।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন।
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।

"কবি উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করেন, শরন কঠিন দ্রুত রচনায় প্রশংসনীয়, শৃঙ্গারবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকবিতা রচনাবিষয়ে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের কেহ সমকক্ষ নাই, কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর, কেবল কবি জয়দেবই সর্ব্বভাবপরিশুদ্ধ সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে জানেন!" অর্থাৎ মুক্তভাবে হরিপ্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি যেন নিজেই জয়বিক্রমে সকলকেই defy—জয়ার্থ আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে সকলকেই জয় করিয়াছেন—কেবল কবি জয়দেবই সর্ব্বভাবপরিশুদ্ধ সম্পূর্ণগ্রন্থ রচনা করিতে জানেন। জয়দেবের উপরোক্ত শ্লোকে হরি প্রেমরসসম্বলিত সংস্রোচ্ছ্বাস বিদ্যমান।

অনন্তর জয়দে[illegible]প্রেমে সরস চিত্ত হইয়া জয়শীল পুরুষের ন্যায় সর্ব্বোপরি নিজরচনার বিক্রম প্রতিষ্ঠা করতঃ গীতগোবিন্দের প্রথম গীতেই হরির নামে জয় জগদীশ হরে বলিয়া জয়কীর্ত্তন করিলেন :—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ ১॥ ধ্রুবম্
ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণীধারণকিণ চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয়জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্পতি কমনীয়ং
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥

বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতি মিলিত যমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥

শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

"হে কেশব প্রলয় সমুদ্র জলে বেদসমূহ মগ্নপ্রায় হইলে আপনি মীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া নৌকার ন্যায় তাহাদিগকে অখিন্নভাবে রক্ষা করেন। মীন-শরীরধর! জগদীশ হরে আপনি জয়লাভ করুন।

হে কেশব! অন্য এক সময়ে পৃথিবী আপনার অতিবিপুলতর পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া রক্ষা পায়; তখন সেই মহিমান্বিত পৃষ্ঠদেশ ধরণীধারণঘর্ষণে কিণাঙ্কিত হইয়া আরও গৌরব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হরে! কচ্ছপরূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ২ ॥ কেশব! তৃতীয় অবতারে ধরণী আপনার অমল দশনশিখরে লগ্ন হইয়াশশিমণ্ডলে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। হরে শূকররূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৩ ॥ কেশব! পদ্মের অগ্রভাগ অতিকোমল হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার করপল্লবরে একসময়ে নখরূপ অদ্ভুত অগ্রভাগ আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুরূপ ভ্রমরের শরীর বিদীর্ণ করে। হরে নৃসিংহরূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৪ ॥ কেশব! আপনার পদনখনীরে জগৎ পবিত্র হইয়াছে; এক সময় আবার অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই পদে জগৎ আক্রমণ পূর্ব্বক আপনি বলিকে ছলনা করেন। হরে বামনরূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৫ ॥ কেশব! আবার এক সময়ে আপনি ক্ষত্রিয়রুধিরে পৃথিবীকে স্নান করাইয়া তাহার পাপ সন্তাপ নিবারণ করেন। হরে ভৃগুপতিরূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৬ ॥ কেশব! বল-রামরূপে আপনি জলদের ন্যায় বসন পরিধান করেন; তখন শুভ্র অঙ্গে সেই সুনীলবসন হলাকর্ষনভয়ে সমুপস্থিত যমুনার ন্যায় শোভিত হয়। হরে হলধর-রূপধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৮ ॥ কেশব! অন্যাবতারে পশুহিংসা দর্শন করিয়া আপনার দয়াদ্রহৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, আহা! তখন সেই হিংসা দোষ দেখাইয়া আপনি যজ্ঞবিধির বেদসমূহকে নিন্দা করেন। হরে বুদ্ধশরীরধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ৯ ॥ হে কেশব! কলিশেষে আপনি দুরাচার ম্লেচ্ছদিগের বিনাশার্থ অতি বিস্ময়কর ধূমকেতুর ন্যায় প্রচণ্ড করবাল ধারণ করেন। হরে কল্‌কিশরীরধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ১০ ॥ শ্রীজয়দেব কবিকথিত আপনার এই স্তোত্র অতি শুভদ, সুখদ ও পৃথিবীর শ্রোতব্যবিষয়ের সার; কেশব! আপনি ইহা শ্রবণ করুন। হরে দশা-বতারধর! আপনি জয়লাভ করুন ॥ ১১ ॥

গীতগোবিন্দের প্রথম গীতে তিনি হরির জয়জয়কার জয় জগদীশ বলিয়া করিলেন, পরে দ্বিতীয় গীতে হরির নামে জয় জয়দেব বলিয়া জয় গাহিলেন। দ্বিতীয় গীতটীতে হরির নামে যে জয় জয়দেব বলিয়া জয়জয়কার করিলেন তাহার মধ্যে যেন কবির কৌশলের পরিচয় পাই; তিনি যেন মনে হয় দ্ব্যর্থভাবে 'জয় জয় দেব হরে' ব্যবহার করিয়াছেন; প্রথমে তাঁহার হরিকে একবার তিনি জগদীশ বলিয়া জয়জয়কার করিলেন; পরে হরি তাঁহার প্রাণের ইষ্টদেব কি না, সেইহেতু তাঁহার যেন হরিকে একবার 'দেব' বলিয়া জয়জয়কার করিতে ইচ্ছা হইল ও তৎসঙ্গে কৌশলে হরির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার নিজের নামেও যেন জয়জয়কার করা হইয়া গেল!—

তখন দেব কথাটীর সঙ্গে একটা জয় যুক্ত করিলেই হইল অর্থাৎ জয় জয়-দেব হরে আর পূর্ব্বেরটা রহিল জয় জয় দেব হরে।

আমরাও এই সঙ্গে এই গানটীর সঙ্গে সঙ্গে একবার জয় জয়দেব হরে করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

গীতম্। ২।

গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে।

শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে ॥ ১ ॥ ধ্রুবম্।
দিনমণিমণ্ডল ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥ ২ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ ৩ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ॥ ৪ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবন ভবননিধান ॥ ৫ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ৬ ॥
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ৭ ॥
তবচরণে প্রণতা বয়মিতিভাবয় কুরুকুশলং প্রণতেষু ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ৯ ॥

হে কমলাকুচমণ্ডলবিহারি! কুণ্ডলভূষণ! ললিতবনমালাধর! হরে দেব! আপনি জয়লাভ করুন। ১। হে সূর্য্যমণ্ডলের ভূষণ ভববন্ধনখণ্ডন! মুনি-গণের মানসবিহারী হংস! আপনি জয়লাভ করুন। ২। হে কালিয়সর্পদমন!

জনরঞ্জন! যেমন সূর্য্যদর্শনে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে সেইরূপ আপনাকে দেখিয়া যদুকুল আনন্দে প্রফুল্ল হইত; হরে! আপনি জয়লাভ করুন। ৩। হে মধুবিনাশন! মুরারি! নরকান্তকারি! গরুড়বাহন! সুরগণের ক্রীড়া-বিহারের নিদান! হরে দেব! আপনি জয়লাভ করুন। ৪। হে দেব! আপনার বিশাললোচন শুভ্র কমলপত্রের ন্যায় সুন্দর; হে ভবমোচন! আপনি ত্রিভুবনের উৎপত্তি স্থান; হরে! আপনি জয়লাভ করুন। ৫। হে দেব! রামরূপে আপনার কমনীয় নীলকলেবর জনকসুতার হেমাঙ্গে ভূষিত হইয়াছিল হে দূষণান্তক! দশকণ্ঠনিধনকারি! আপনি জয়লাভ করুন। ৬। হে নব-জলধরসুন্দরকান্তি! মন্দরধারি! লক্ষ্মীবদনচন্দ্রের চকোর! দেব! আপনি জয়লাভ করুন। ৭। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আপনি অবধান করুন ও প্রণতজনেব কুশল বিধান করুন। হরে দেব! আপনি জয়লাভ করুন। ৮। শ্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গলাচরণস্বরূপ উজ্জ্বলগীতিময় বাক্য আপনার আনন্দ বিধান করুন। হরে দেব! আপনি জয়লাভ করুন।৯।

সর্ব্বশেষে উপসংহারে বক্তব্য যে এই জয়দেবের এই জয়কীর্ত্তন স্বাভাবিক কবিহৃদয়োত্থিত হইলেও তিনিও এবিষয়ে প্রাচীন কবিদের মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন; কবিশ্রেষ্ঠ মহাভারতের ব্যাসদেবও কতকালপূর্ব্বে তাঁহার মহা-ভারতরূপ মহাকাব্যে প্রত্যেক পর্ব্বারম্ভে জয়কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন;

"ওঁ নমস্কৃত্য নারায়ণং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

"নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয়োচ্চারণ করিবে।"

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ভারতের শ্রেষ্ঠতম রত্ন মহাত্মা মহর্ষি মনু আপনার শ্রেষ্ঠ সংহিতার একাংশে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।"

মনুর এই একটী মাত্র শ্লোকার্দ্ধে যে গভীর অর্থ নিহিত আছে, এমন প্রাণারাম চিরশান্তিপ্রদ মধুর উপদেশ জগতের অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র তো দূরের কথা, ভারতের আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহস্থল। আমাদের দেশে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্য লাভের যে যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মধ্যে মহাত্মা মনুনির্দ্দিষ্ট এই পন্থা,— "প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা", যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। "একমাত্র প্রবৃত্তি দমনেই যে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন—অশেষ পুণ্য লাভ হয়",—ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে যে, যখন যে দেশের উন্নতি হইয়াছে, তখন সেই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মনুর এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া। আবার যখন যে দেশ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তখন সেই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাই, মহর্ষি মনুর এই মহামন্ত্র এককালে পাপ-কর্ম্মনাশার জলে চিরদিন তরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। একদিন আমাদের এই চির পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে উন্নতির চরমসীমায় উঠিতে পারিয়াছিল, তাহার একমাত্র প্রধানতম কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর সেই,— "প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা",—এই মহামন্ত্র প্রত্যেক ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার প্রত্যেক শোণিত কণায় উজ্জ্বলতর ভাবে জ্বলিতেছিল বলিয়া। আবার যে দিন হইতে ভারতের নরনারী এই মহামন্ত্র বিস্মৃতির অতলসলিলে বিসর্জ্জন দিয়া পাপাবিলাসিতার কুহকিনী শক্তিতে

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই দিন—সেই কাল মুহূর্ত্ত হইতে ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হইয়া এখন সেই অধঃপতন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে। আবার যদি কখন আমাদের এই দ্রুত অধঃপতনের বেগ রোধ হয় তবে সেই দিন—সেই মহা মুহূর্ত্তে হইবে, যে মহামুহূর্ত্তে আমরা পাপবিলাসিতার মস্তকে বামপদাঘাত করিয়া বহুদিন-বিস্মৃত মানবরত্ন মনুর সেই অশেষ কল্যাণকর মহামন্ত্র—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সতত শয়নে, স্বপনে, জপ করিতে পারিব, সেই মহামন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই পথানুসরণে আমাদের দুর্দ্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব। সেইদিন সেই শুভমুহূর্ত্তে আবার আমাদের উন্নতির সূত্রপাত উপস্থিত হইবে।

"প্রবৃত্তি দমনেই যে মহাফল"—এ কথার মর্ম্ম এখন বুঝিয়াছি। আত্ম-জীবনের এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল জীবন সংগ্রামের কঠোর হইতে কঠোর-তর—কঠোরতম ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—একথা খাঁটি সত্য কথা। জীবনের এই এতদিন, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া জীবনের সকল শান্তি দূর করিয়াছি তাহাও প্রবৃত্তি দমনে কোন যত্ন করি নাই বলিয়াই। আবার জীবনে সময়ে সময়ে কচিৎ কদাচিৎ যে দুই একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি তাহাও এই দুর্দ্দমনীয় প্রবল প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই। আমাদের আত্ম-জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান কালে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতেও সতত তাহাই ঘটিতেছে। এই যে সুদূর হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতে যে হাহাকার উঠিয়াছে—দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে সতত যে লোকক্ষয় হইতেছে, হা অন্ন! আ অন্ন! করিয়া আমরা যে দিন দিন নৈরাশ্যের গভীর আতঙ্কে সতত অস্থির হইয়া, জীবন মৃত্যুর সংশয় দোলায় দুলিতেছি তাহারও একমাত্র প্রধানতম কারণ, আমরা আমাদের বড় হিতা-কাঙ্ক্ষী—আমাদের দেশের গৌরবাদিত্য মানবরত্ন মহামতি মনুর সেই—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—এই অশেষ নীতিপূর্ণবাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার শক্তিহারা হইয়াছি বলিয়াই। সুতরাং আবার আমা-

দের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে আবার আমাদিগকে আমাদিগেরই বড় শুভার্থী মহর্ষি মনুর সেই—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"— এই মহামন্ত্র সতত শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, শোকে দুঃখে, হর্ষে ও বিপদে জপ করিতে হইবে, এই মহামন্ত্র অনুসারে আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেক ছোট বড় কার্য্য করিতে হইবে—ইহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে, আমাদের জাতীয় উন্নতি কখনই সাধিত হইবে না—হইবার নহে।

এই প্রবল প্রবৃত্তি দমন কার্য্যে এখন আমাদিগকে এমনই ভাবে চলিতে হইবে যে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে শত বাধা ও বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া এই পাপপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের এক প্রধান কারণ—আমাদের দেশীয় শিল্পনাশ। আমাদের দেশের এই যে শিল্প—যে শিল্পজাত দ্রব্য একদিন জগতকে মোহিত করিয়াছিল, একদিন যে শিল্পজাত দ্রব্য ভারতকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিল, সেই দেশীয় শিল্প প্রভৃতির অধঃপতন একমাত্র আমাদেরই প্রবল প্রবৃত্তি দমনের সম্পূর্ণ বীতস্পৃহতার জন্য ঘটিয়াছে—একথা খাটি সত্য। হায়! আমরা যদি মহাত্মা মনুর সেই মহাবাক্য মস্তকে ধরিয়া, পাপবিলাসিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বিলাসী না হইতাম, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিল্প কখনই নষ্ট হইত না; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে এই হাহাকার—এই নিত্য দুর্ভিক্ষ— নিত্য লোকক্ষয় এবং রোগে, শোকে, গভীর নৈরাশ্যে কখনই আমাদিগকে এমন করিয়া ঘোর হাহাকার করিতে হইত না।

আজ পাশ্চাত্য জাতির পাপবিলাসিতার মোহিনী শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা যে কণ্টকপূর্ণ পাপপথে স্বেচ্ছায় পদার্পণ করিয়া, নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি, তাহারই ফলে এই দেড় শত বৎসরের অশেষ কষ্ট—অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও আমরা আমাদের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারিতেছি না—কোন দিন পারিব কিনা একমাত্র বিধাতাই বলিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান হাহাকার, নিত্য দুর্ভিক্ষ —দুর্ভিক্ষে নিত্য লোকক্ষয়, ইহার অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের প্রবৃত্তি দমনে অনিচ্ছা। নহিলে, আজিও আমাদের দেশে বৎসর বৎসর যে শস্য

উৎপন্ন হয়—বৎসর বৎসরই বা বলি কেন? অতি দুর্ব্বৎসরেও যে শস্য উৎপন্ন হয়, রাজার প্রাপ্য রাজকর দিয়াও তাহা যদি দেশে থাকিত তাহা হইলে আমাদের এমন শোচনীয় দুরবস্থা কখনই হইত না—প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষে এমন লোকক্ষয় করিত না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির দোষে আমরা আমাদের প্রবল প্রবৃত্তি দমনে সম্যক্ অসমর্থ হইয়া, বিদেশজাত বিবিধ বিলাস দ্রব্যের বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া, যতই দিন দিন সে সকল আত্মসাৎ করিতে নিপুণ হইতেছি, ততই দিন দিন আমরা ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে চলিয়াছি,—কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক পরিতাপের বিষয় যে, এত কষ্টেও আমাদের চৈতন্য নাই—আমাদের পাপ প্রবৃত্তি দমনে কিছু মাত্র যত্ন ও চেষ্টা নাই,—ইহা অপেক্ষা ঘোরতর লজ্জা, ঘোরতর অপমান, ঘোরতর মূর্খতা আর কি হইতে পারে—ভগবানই বলিতে পারেন। প্রবৃত্তি দমনের অভাবে আমাদের এমনই অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, আমাদের উদরে উপযুক্ত অন্ন না থাকিলেও বাহিরে বাবুগরির মাত্রার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। যতদিন আমরা প্রতি কার্য্যে আমাদের প্রবল প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিব ততদিন শত আন্দোলনে শতবার শত প্রকারে বাগজাল বিস্তার করিলেও কখন কোন দীর্ঘকালস্থায়ী ফল হইবে না,—প্রবৃত্তি-দমন-ক্ষমতা-শূন্য দেশের লোক সুলভে চাক্‌চিক্যময় বিলাসদ্রব্য ছাড়িতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্রবৃত্তিদমনের অভাবে আমাদের এমনই অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, আমরা বিনা প্রয়োজনে বা অতি অল্প প্রয়োজনে বিলাতি বিলাসের জিনিষে গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছি, বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকার তীব্র হলাহল তুল্য সুরাপান করিয়া অধঃপাতে যাইতেছি—কে তাহার সংখ্যা করিবে? অথচ এই সব বিষতুল্য সুরা প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের জন্যও আমরা আমাদের দেহের শোণিততুল্য খাদ্যদ্রব্য বিদেশীয়কে দিয়া আমরা চিরহতভাগ্য ভারতবাসী তৎপরিবর্ত্তে নিত্য দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষে নিত্য লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়—নিত্য হাহাকার, নিত্য মহামারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আজ লিখিতে কলঙ্কে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়, দেশে শত শত লোক এক মুষ্টি অন্নের জন্য বন্যপশুর ন্যায় আপনাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে, অথচ অতি অপদার্থ আমরা আমরা শিক্ষিত হওয়া সত্বেও

পাপ প্রলোভন ও প্রবল প্রবৃত্তিদমনে অশক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার বিলাসিতা-লিপ্ত বিদেশীয় দ্রব্যের জন্য সকল শ্রেয়ের পথে কণ্টক আনয়ন করিতেছি, আমরা দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সভা করিতেছি—বক্তৃতা করিতেছি—কাগজে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেছি রাজার কুৎসা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছি, বস্—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমাদের স্ব স্ব সাধ্যায়ত্ত যেটুক উপকার, যেটুকু ত্যাগ স্বীকার আমরা অনায়াসে করিতে পারি, পাছে আমাদিগকে প্রবল প্রবৃত্তির দমন করিতে হয় এই ভয়ে আমরা তাহা করি না—কখন করিব না, কারণ পাছে আমাদের পাপবিলাসিতা ষোলকলায় পূর্ণ হইবার পথে কোন বাধা পড়ে; পাছে আমাদের Sherry, Whisky বা Champagne প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের কোন খাঁকতি পড়ে!

"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—এই মহামন্ত্র আজ আমাদিগকে সতত জপ করিতে হইবে এবং এই মহামন্ত্রের বলে হৃদয় হইতে পাপ প্রবৃত্তির অঙ্কুর পর্য্যন্ত সমূলে ও সবলে উৎপাটিত করিতে হইবে। মহর্ষি মনু প্রণীত এই—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—মন্ত্রকে বীজমন্ত্রে পরিণত করিয়া সতত জপ করিতে হইবে এবং যখনই কোন বাহ্যচাকচিক্যময় বিলাসিতার দ্রব্য দেখিয়া আমাদের পাপমন উহার প্রতি ধাবিত হইবে তখন মহাত্মা মনুর ঐ মহামন্ত্র "প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" জপ করিতে করিতে উদ্বেলিত প্রবল প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, ঐ সকলের প্রতি বামপদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এমনই করিয়া কঠোর সাধনা করিতে না পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনই আশা নাই।—আমাদের সৌভাগ্য সূর্য্য আবার উদয় হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান কালে আমাদের জীবন সমস্যা যে প্রকার গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে অযথা নিস্প্রয়োজনীয় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া দেশের অর্থ যাহাতে দেশে সঞ্চিত থাকে, প্রাণপণে আমাদিগকে এখন সেই চেষ্টাই করিতে হইবে তাহা না হইলে আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। এই পাপবিলাসিতা এককালে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই—জাতীয় উন্নতির কোনই আশা নাই। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ যে, আমাদের বড় হিতার্থি মহর্ষি মনুর সেই—"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং

নিবৃত্তিস্তু মহাফলা” মন্ত্রকে পাপপ্রবল প্রবৃত্তি দমনেব বীজমন্ত্র করিয়া সতত এই মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ হইতে আমাদের পাপ প্রবৃত্তিগুলির উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, তাহা হইলেই আবার ভগবান আমাদিগের মুখের প্রতি চাহিবেন, এই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি পীড়িত, ভারতাকাশে শান্তিশশী উদয় হইয়া, দীনহীন পরপ্রত্যাশী ভারতবাসীকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া জগতে ভারতবাসীকে পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চাসনে বসাইবেন। প্রত্যেক ভারতবাসী কি হিন্দু অহিন্দু সকলকেই * সতত এই একমন্ত্র মনে রাখিতে হইবে।

“প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।”

শ্রীউমেশ চন্দ্র মৈত্রেয়।

---

* “প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা” এই মন্ত্রে হিন্দু অহিন্দু সকলেই দীক্ষিত হইতে পারেন, ইহাতে মুসলমান বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাদের কাহারই বিরাগের কোনই কারণ নাই। কারণ মহাত্মা মনুর এই ধর্ম্মবাক্য অতি সরল ও সহজ এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের ইহা আদরের সহিত গ্রাহ্য। এবং “প্রবৃত্তি দমনেই যে মহাপুণ্য” ইহা বোধ হয় সকল শাস্ত্রকারেরাই স্বীকার করিবেন।

লেখক।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র।

প্রিয় রাজনারায়ণ,

অনেক দিন হইল তোমার নিকট হইতে কোন চিঠি পাই নাই, আমিও তোমায় অনেক কাল লিখি নাই, কিন্তু আমি সেই অবধি কেবল নাটকই লিখিতেছি—একটী রীতিমত বিয়োগান্ত নাটক গদ্যে লিখিতেছি! ইহার গল্পটী টড (প্রথম খণ্ড ৪৬১ পৃঃ) হইতে গৃহীত। বোধ হয় অভাগিনী রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর গল্পটা তোমার ভাল রকম জানা আছে। আর একটা অঙ্ক কেবল লিখিতে বাকী আছে, সেটী পঞ্চম অঙ্ক। আর তাহা ছাড়া ইহার পূর্ব্বে মেঘনাদ কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়টীর একটী নকল করিবার জন্য একটী লোকও পাই নাই। যে নকল আমি পাঠাইতেছি যদিও উহা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত, উহাতে এত বেশী বানান ভুল আছে যে আমি বলিতে পারি না তুমি পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিবে কি না। কিন্তু তুমি একজন বিশেষ সমজদার লোক; বেশীদিন আগে নয় 'শিব' কথাটী 'ষীব' এই রকম ভাবে লিখিত হইলে অথবা আরও অনেক কথা কদর্য্য ভাবে বানান করিলে তুমি কিম্বা আমি দুজনের কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিতাম না। বাস্তবিকই আমাদের ভাষাটী (লেখক আলফাএরীর সহিত আমিও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না "আমাদের দেব ভাষা") দ্রুত গতির সহিত পূর্ণতার পথে চলিয়াছে, এবং ইহার বহুকালের নির্জীব অসাড় অবস্থাও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যাহা পাঠাইলাম সেটা পড়িয়া কি করিতে পার দেখিও। তুমি ত কবি হোমারের কাব্য পাঠ করিয়াছ, এটা পড়িলে নিশ্চয়ই ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদটী মনে পড়িবে। আমি বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই ইহার অনুকরণ করিয়াছি—যে অংশে আইডা গিরিতে জুনো জুপিটারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন সেই অংশের। আশা করি আখ্যানটীকে যতদূর সম্ভব হিন্দুভাবে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছি: আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই

গোপন রাখিতে চাই না; তুমি যেন মনে করিও না আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী —আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি যে মেঘনাদ কাব্যটী ক্রমশঃ একটী দিব্য উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থরূপে দাঁড়াইবে। আমার ত মনে হয় ইহার ছন্দে বেশী মাধুর্য্য আছে ও কবি ভার্জিলেরও ধরণে লেখা। ইহার ভাষাও সরল ও কোমল, ইহার পূর্ব্বের কাব্যটী একটু বরং কর্কশ ছিল এবং বোধ হয় সেই কর্কশ ভাবটুকু ইহার মধ্যে তুমি দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তোমার যেমন মনে হইবে তুমি তেমনি বিচার করিতে পার। তিলোত্তমার বেশ কাটতী হইতেছে, প্রথম সংস্করণটী প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এমন কি প্রাচীন গোঁড়া পণ্ডিতগণকেও প্রকৃত পথে আসিতে হইতেছে, এবং সোমপ্রকাশ যে রকম ভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছে তাহা বরঞ্চ উৎসাহজনক। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এখন খুবই চলন। বৃদ্ধ রণজিৎ সিং ভারতবর্ষের মানচিত্রদৃষ্টে যেমন বলিতেন "সব লাল হো যাএগা", আমিও তেমনি বলিতেছি "সব অমিত্রাক্ষর হো যাএগা"। গত রজনীতে রঙ্গলালের সঙ্গে ছন্দ সম্বন্ধে—বিশেষতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া আমার অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন "অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে সকলের উৎকৃষ্ট ছন্দ তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমার মতে যাঁহারা কেবল ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ এখন কিছুকাল ইহার সমাদর করিবেন না।" আমি ঈষৎ হাসিলাম এবং বলিলাম "ক্ষতি নাই!" আমি এবিষয়ে একটুও গ্রাহ্য করি না যে ইহা কোন্ সময়ে সাধারণ্যে আদৃত হইবে, যদি আমি কেবল জানিতে পারি যে ইহা ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে লোকপ্রিয় হইবেই। আশা করি, প্রিয় রাজ, তুমি চিঠি পত্র লেখা সম্বন্ধে যেন আমার অনুকরণ না কর—অর্থাৎ যদি এড়াইতে পারি তাহা হইলে সহজে আমি বন্ধুদের চিঠি লিখি না। তুমি খুব পরিশ্রমী এবং যথানিয়মে চল, আর আমি নিতান্তই অলস। তোমার নিকট হইতে একটা বড় চিঠির প্রতীক্ষায় রহিলাম—তাহা যেন জীবনী, ইতিহাস ও সমালোচনা পূর্ণ হয়।

গৌরদাস এখন কলিকাতায় আছে, যেন কঠিন পরিশ্রমের সহিত আইন পাঠে ব্যস্ত, কিন্তু আসলে সে মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছে। অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে জানাও আমার তাহাই ধারণা। প্রত্যেক দিন সোসাইটীর গৃহ

হইতে তাহার বাড়ী ফিরিবার কালে তাহার সহিত আমার একবার করিয়া দেখা হয়। সে লোকটী ভাল, তাহার কার্য্য সফল হউক!

বন্ধুবর, আমি কতবার মনে করি তোমায় জিজ্ঞাসা করিব আমাদের নাটকগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তোমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত কি না। যখন মনে করি যে বাধ্য হইয়া আমায় গদ্যে লিখিতে হইতেছে তখন বাস্তবিকই আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আর উপায়ই বা কি? আমি চেষ্টা করিয়াও কাহাকে রাজী করাইতে পারি নাই যে এক অংশও কবিতায় অভিনয় করে। আমি চাই যে তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা আমাকে ভালরূপ বুঝাইয়া দাও যে নাটকের ভাষাই হইতেছে গদ্য, তাহা হইলে আমি মনের মধ্যে একটু শান্তি পাই।

তোমার সেই ধর্ম্মবিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ কতদূর হইল? আমি তোমার একজন অল্পবয়স্ক বন্ধুকে জানি—তিনি হইতেছেন গাঙ্গুলী—দেবেন্দ্রের জামাতা;* তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই "সুপ্রিম কোর্টে" দেখা সাক্ষাৎ হয়, এবং তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলেন তুমি মানব জাতির উৎপত্তি বা এই রকম কি একটা গুরুতর বিষয় লিখিতেছ। লোকটী বেশ ভাল মেজাজের, গম্ভীর, এবং আমার বিশ্বাস কুপ্রকৃতির নন। এত লোক আমাকে এই নূতন ছন্দের গঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন যে আমাকে বাধ্য হইয়া এবিষয়ে ভাবিতে হইয়াছে এবং শেষে এই বুঝিলাম যে পংক্তির অষ্টম সিলেবিলের উপর "যতি" না পড়িয়া স্বভাবত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সিলেবিলের উপর পড়িতেছে; যেমন—

"জয় জয় অমরারি, যার ভূজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুতরিপু
বজ্রী!————————তিলো ৪
"চল বঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ।"————————মেঘনাদ। ২
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্ত গদামারি

* স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

খেদাইনু”—————তিলো। ২
আইলেন যক্ষেশ্বরী মূরজা সুন্দরা
কুঞ্জরগামিনী—————তিলো।”

ইত্যাদি। আশা করি তোমার যে সকল বন্ধুগণের বিষয় কিছু দিন হইল লিখিয়াছিলে এই ব্যাখ্যা তাঁহাদের মনোমত হইবে ; ইহার বেশী আমার আর বলিবার নাই।

এইবার শেষ করি। আশা করি দুর্গাপূজার সময় আমরা যেখানে যাব মনস্থ করিয়াছি তুমি যেন আবার মতের পরিবর্ত্তন না কর।

তোমার স্নেহের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

লুচিতরকারি। *

আমাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইবার আহার করা রীতি আছে। মুনিঋষিরা দুবার খাবারেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন—

“মুনিভির্দ্বিরশনম্প্রোক্তং।” (কাত্যায়ন)

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

“সায়ংপ্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং দেবনির্ম্মিতম্।”

“দ্বিজাতিগণের সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুইবার খাওয়াই প্রশস্ত।” আমাদের সকালের দিকে যেমন প্রধান খাবার ডালভাত তেমনি বৈকালের প্রধান খাবার লুচিতরকারী।

---

* দশ বৎসর পূর্ব্বে (১৩০৩ সালের সাহিত্য পত্রে) খাবারের নামতত্ত্ব প্রবন্ধে বাঙ্গলায় জলপান (অর্থাৎ পানতোয়া জিলাবি প্রভৃতি) খাবারের বাঙ্গলা নাম উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে লুচিতরকারী সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথাই বলা হয় নাই।

লেখক।

লুচিটা প্রকৃতপক্ষে অপূপ বা পিষ্টকজাতীয়। যাহা পেষিত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত তাহাই 'পিষ্টক' শব্দ বাচ্য। গোধূম বা তণ্ডুলাদি চূর্ণ প্রভৃতি পেষিত দ্রব্য-প্রস্তুত খাদ্যমাত্রেই পিষ্টকশ্রেণীর অন্তর্গত। অপূপ ও পিষ্টক উহারা একার্থবাচক।

"পূপোঽপূপঃ পিষ্টকঃ স্যাৎ।" (অমর কোষ)

"পিষ্টক" শব্দ 'পিষ্ট' শব্দ হইতে উৎপন্ন। "পিষ্ট" শব্দের অর্থ নিরুক্তকার লিখিয়াছেন—"অবয়বশো বিভক্তং" "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বে যাহা বিভক্ত অর্থাৎ চূর্ণিত"। লুচি, রুটী, বড়া (বটক), লাড়ু (লড্ডুক), কচুরী, পুরী, পরোটা ইহারা পেষিত বা চূর্ণিত গোধূমাদি হইতে প্রস্তুত বলিয়া সকলেই পিষ্টক জাতীয়, কিন্তু ভক্ত বা ভাত পিষ্টক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, কারণ, উহা পেষিত দ্রব্য-প্রস্তুত নহে।

এই পিষ্টকজাতীয় খাদ্যসামগ্রী বড় আজকালের উদ্ভাবিত নহে। যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে আদিম কাল হইতে এই অপূপ শ্রেণীর খাদ্য ভারতে প্রচলিত। বৈদিক যুগে যে সময়ে যজ্ঞের আবির্ভাব সেই সময়ে এই পিষ্টক জাতীয় খাদ্য ভারতে প্রসার লাভ করে। ঋগ্বেদে এই পিষ্টকজাতীয় নানাবিধ খাদ্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য দান করিবার কালে বলিতেছেন—

"ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তং * উকথিনং ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ।" †

"হে ইন্দ্র! ভৃষ্টযবযুক্ত, দধিমিশ্রিতসক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্‌থ্‌-বিশিষ্ট হব্য আমাদের প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর।"

এই 'অপূপ'এর আকার যে কিরূপ তাহাও বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

---

* দধিমিশ্রিত সক্তুকে বৈদিকযুগে 'করম্ভ' বলিত। এক্ষণে আমাদের দেশে করম্ভের বড় একটা প্রচলন নাই। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে 'করম্ভ' প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। তবে সে দেশে দধি দুর্লভ বলিয়া তদভাবে নারিকেলদুগ্ধ এবং সক্তুর অভাবে তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

† ঋগ্বেদ ৩য় অষ্টক, ৩য় অধ্যায়, ৫২ সূক্ত।

"অপূপান্ ত্রৈয়ম্বকপ্রমাণান্।" (গোভিল গৃঃ সূত্র)

"অপূপগুলি করতল প্রমাণ অর্থাৎ হাতের চেটোর মত হইবে।" আমাদের আধুনিক লুচি প্রভৃতি পিষ্টকজাতীয় অধিকাংশ খাদ্যের আকার অনেকটা হাতের চেটোর মত। লুচি প্রভৃতির ন্যায় অপূপগুলিকে যে বৈদিক কালে ঘৃতসন্তাপিত করা হইত তাহাও পূর্ব্বোক্ত গৃহ্যসূত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন,—

"শৃতানভিঘার্য্যোদগুদ্বাস্য প্রত্যভিঘারয়েৎ।"

"অপূপগুলি সুপক্ক হইলে অভিঘারিত করিয়া অগ্নির উত্তরভাগে নামাইয়া পুনবায় ঘৃতে সম্বলিত কবিবে।"

এই বৈদিক 'পূপ' বা 'অপূপ' নাম এখনও আমাদিগের কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে দেখা যায়। যেমন 'পূপ' হইতে 'পুয়া' (মালপুয়া) আসিয়াছে। ইংরাজী 'পাই' (pie) শব্দটী আমাদের 'পুয়ার' ন্যায় বৈদিক পূপ শব্দ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ ইংরাজের 'পাই' ও আমাদের 'পূপ' একই শ্রেণীর খাদ্য। সংস্কৃত "পিষ্টক" শব্দ বঙ্গীয় সাধু ভাষায় অপ্রচলিত না থাকিলেও বঙ্গভাষায় "পিষ্টক" অনেকগুলি প্রাকৃত শব্দেরও সৃষ্টি কবিয়াছে দেখা যায়। 'পেটালি' (গুড়ের পেটালি) 'পিটুলি' (চালের পিটুলি), 'পিটে' ইত্যাদি অনেকগুলি প্রাকৃত শব্দ বঙ্গভাষায় পিষ্টক শব্দের বংশজাত। এই "পিষ্টক" শব্দ য়ুরোপীয় ভাষাসমূহেও বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। লুচি রুটীর শ্রেণীব খাদ্যকে ইংরাজীতে 'পেষ্ট্রি' (Pastry) বলে। এই (Pastry) শব্দ যে পিষ্টক শব্দ প্রসূত তাহা শব্দের আকার ও অর্থসাদৃশ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত। Pastry, Pastil (মিষ্ট পিষ্টক বিশেষ), Patti, এ সকলি সংস্কৃত পিষ্টক শব্দপ্রসূত ; ভারতীয় শব্দ বিদেশে নীত হইয়াছে মাত্র।

এক্ষণে দেখা যাক আমাদের দেশীয় পিষ্টক শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য লুচির উৎপত্তি হইল কিরূপে? কোন সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থেই 'লুচি' লুচিকা অথবা লুচির অনুরূপ শব্দ কোন খাদ্যদ্রব্যের নামরূপে পাওয়া যায় না। লুচি বস্তুত সংস্কৃত শব্দপ্রসূত নহে। কি মহাভারতাদি পুরাণ কি বৈদিক গ্রন্থ কি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ কোথাও 'লুচি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

লুচির মূল হিন্দি ভাষায়। * লুচি প্রকৃতপক্ষে হিন্দি শব্দ। অথচ আশ্চর্য্য যে এক্ষণে বঙ্গবাসীরা যেরূপ লুচির ভক্ত হিন্দুস্থানীরা তাহার একাংশও নহে। ডালরুটী বা পুরাই পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীদিগের রসনা পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন কি হিন্দুস্থানী অনেকে লুচিকেও পুরী নামে অভি-হিত করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ভক্ত তুলসীদাসের সময়ে লুচি হিন্দুস্থানে সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ খাদ্যরূপে পরিগণিত ছিল '—ইহা তাঁহার বচন হইতেই জানিতে পারা যায়। ভক্ত তুলসীদাস বলিতেছেন—

মাঙ্গেহুতে ন মিলে
মড়ুয়াউকি চূণ্
তুলসী রামপ্রতাপসে
লুচুই দুনো জুন্।

"পূর্ব্বে ভিক্ষা করিলে মেড়ুয়ার আটা মিলিত না কিন্তু এক্ষণে রাম নামের প্রতাপে দুবেলা লুচি পাইতেছি।" লুচি বলে কেন? কোন জিনিষ হাত হইতে পিছলিয়া পড়িবার মত হইলে হিন্দিতে 'লুচ্যাতা' বলে। আবার কোন কোমল পিচ্ছিল দ্রব্যকে 'লুচ্ লুচিয়া' বলে। লুচি সচরাচর ঘৃতে পিচ্ছিল থাকে বলিয়াই হিন্দিভাষায় 'লুচি' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

বৈকালিক খাদ্যে লুচি প্রধান হইলেও পাত্ররূপ আসনে লুচি কিন্তু একাকী বসিতে চাহে না। লুচি যখন পাত্রমধ্যে বিরাজ করে তখন তরকারীবিহীন হইয়া শোভমান হয় না। লুচি যেন পুরুষ তরকারী যেন স্ত্রী। তরকারী বলিতে ছোঁকা, ভর্ত্তা, ভাজিভুজি ডালনা সবই আসিয়া পড়ে। তরকারী একটা সাধারণ নাম। তরকারী শব্দের মূল বঙ্গীয় অভিধানকারেরা সংস্কৃত 'তৃপ্তিকারী' শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু 'তরকারী'র উৎপত্তি প্রকৃত-পক্ষে 'তৃপ্তিকারী' হইতে হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। হিন্দিভাষায় ফোড়ন দেওয়ার নাম 'তড়্কা'। যথা "করাহীমে ঘী ডাল্ হীংকা তড়্কা দেবে।" অর্থাৎ "কড়ায় ঘি ঢালিয়া হিংএর ফোড়ন দেবে।" আমার মনে হয় এই

---

* বিশ্বকোষে লুচি' দেশজ শব্দ অর্থাৎ বাঙ্গলার প্রাকৃত শব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক।

'তড়্কা' হইতে 'তড়্কারি' শব্দ আসিয়া থাকিবে। কারণ ছোঁকা প্রভৃতি সমস্ত তরকারীজাতীয় খাদ্যগুলিতে ফোড়নই বিশেষভাবে কার্য্য করে। ফোড়নের বলেই তরকারির আস্বাদ ও সুগন্ধ হয়। যেমন ফোড়ন দিয়া ছুঁকিয়া লইতে হয় বলিয়া 'ছুঁকা' হইতেই 'ছোঁকা' নাম হইয়াছে সেইরূপ সম্ভবতঃ সমস্ত তরকারীতেও 'তড়্কা' অর্থাৎ ফোড়নই বিশেষ ভাবে ক্রিয়া দেখায় বলিয়া সাধারণতঃ 'তড়্কা' হইতে তড়্কারি বা তরকারি নাম আসিয়া থাকিবে। হিন্দিতে 'ছুঁক' ও 'তড়্কা' শব্দদ্বয় প্রায় একার্থবাচক। বাঙ্গলার 'চড়্চড়ি'ও তরকারীর অন্তর্ভুক্ত। উহারও 'চড়চড়ি' নাম ফোড়ন দিবার কালে চড়্চড়্ শব্দ হইতে হইয়াছে। দেখা যায় তরকারীজাতীয় অধিকাংশ খাদ্যের নাম ফোড়ন-সংস্পৃষ্ট। 'ছোঁকা'র 'ছোঁক' শব্দটীও ফোড়ন দিবার কালে 'ছ্যাঁক ছোঁক' আওয়াজ হইতে উদ্ভূত। বস্তুতঃ খাদ্যপাকে বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের নিকট বিশেষ ঋণী। তাই আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অনেক নাম আমরা হিন্দুস্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তরকারীর মধ্যে 'ডালনা' শব্দটী খাঁটী হিন্দুস্থানী। 'ডালনা' অর্থাৎ তরকারীর মধ্যে যাহা তরল'ঢালিবার যোগ্য'। ভড়্তা শব্দটী সংস্কৃত মূলক। সংস্কৃত 'ভটিত্র' হইতে 'ভড়্তা' আসিয়াছে। শূলপক্ক মাংসাদির নাম সংস্কৃতে "ভটিত্র"। বেগুনকে মাংসের ন্যায় শলাকায় বিদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইতে হয় তাই বেগুন-পোড়ার নাম ভড়্তা। তরকারীর মধ্যে অন্যান্য খাদ্যগুলির মূল সহজেই নির্দ্দেশ করা যায় বলিয়া তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আহারের রসাস্বাদন অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যের ইতিহাসে, তত্ত্বান্বেষণে অধিকতর তৃপ্তি। খাবারের একটী কথা কত পূর্ব্বকাল হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রাণের রুচি ও তৃপ্তি বহন করিতেছে, সেইটা যদি আজ আমরা কোনরূপে জানিতে পারি তাহা হইলে সে রসাস্বাদনে আমাদের কত না আনন্দ! এই প্রবন্ধে পাঠকগণ সেই অমূর্ত্ত রসাস্বাদন করিতে পাইবেন, ইহাতে হাতে হাতে লুচিতরকারী পাইয়া আহারের মূর্ত্তিমান সুখ পাইবেন না।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺বঙ্গপিতার দানপত্র।

'বঙ্গ-অদর্শন' প্রবন্ধে * আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে আমাদের বঙ্গপিতা আর ইহলোকে নাই। তাঁহার জরাজীর্ণ ভগ্ন † দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ‡ সমগ্র বঙ্গ-সন্তানকে শোকভারে নিমগ্ন করিয়া বঙ্গপিতা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

৺বঙ্গপিতা তিনটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র হিন্দু, মধ্যম পুত্র মুসলমান এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ খৃষ্টান। ¶ হিন্দু পুত্রটী শান্তশিষ্ট—জ্ঞানে ও বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ; তাহার ভাব যুধিষ্ঠিরের মত, শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল। মুসলমান পুত্রটী মধ্যম—গোঁয়ার প্রকৃতির—ভীমের ন্যায় শত্রুর রক্তপানে পটু, আর কনিষ্ঠ পুত্রটী এখনও নিতান্ত অল্পবয়স্ক, ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহারও মতি স্থির হইলে পরিপক্ক-মতি হইলে পিতৃগেহ বঙ্গে বসিতে চাহিবে একবার বিলাত ও একবার ভারত এইরূপে ছুটাছুটি করিবে না। ক্রমে কনিষ্ঠপুত্রটী জানিবে বঙ্গই তাহার পিতৃগেহ। এই কনিষ্ঠপুত্রটীর উপরে বঙ্গের অনেক আশা ভরসা। ভবিষ্যতে ইনি পিতৃ-নাম রক্ষা করিতে বড় যে কম উদ্যোগী হইবেন তাহা মনে হয় না। ছোট ভাইয়ের কোন দোষ দেখিলে বড় ভাই অনেক সময়ে কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে ক্ষান্ত থাকেন না। আজকাল তাই জ্যেষ্ঠ হিন্দুভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠ

---

* ১৩১২ সালের আশ্বিন সংখ্যা পুণ্য দেখ।

† Partition দ্বারা বিভক্ত।

‡ বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই পঞ্চ প্রদেশের মধ্যে যে ভৌতিক বা দৈহিক বিচ্ছিন্ন ভাব যাহা পার্টিশন আনয়ন করিয়াছে তাহাকেই বঙ্গের পঞ্চত্ব, আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

¶ খৃষ্টান বলিতে ইউরেশিয়ন, নেটিব খৃষ্টান ও এংলো ইণ্ডিয়ান সকলকেই বুঝাইতেছে। খৃষ্টানরাও যখন বঙ্গবাসী তখন উহারাও ৺বঙ্গপিতার সন্তান—উহাদিগকে ত্যাগ করিলে চলিবে না।

ভ্রাতার প্রতি 'ফিরিঙ্গি' ইত্যাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখিবেন এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটীই বঙ্গ-পিতার নামে সর্ব্বাগ্রে নিশান উড়াইতে উদ্যত। পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ অর্জ্জুন যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তপোবলে পাণ্ডবদিগের জয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বর্গীয় বঙ্গ-পিতার কনিষ্ঠপুত্রটী ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন পিতার মনস্কামনা সিদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না। বঙ্গ তখন সমগ্র বঙ্গবাসীগণের মহাগেহ (home) রূপে পরিগণিত হইবে। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান সকলেই পিতার আদি-বসতি এই বঙ্গদেশকে পৈতৃক ভিটে বলিয়া গণ্য করিবে। তখন এংলো ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ানের মধ্যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিবে না, সকলেই ভারতবাসী বা ইণ্ডিয়ান বলিয়া আপনার গৌরব করিবে।

মৃত্যুকালে স্বর্গীয় বঙ্গপিতা এক বিশাল বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে বিষয় আর কিছু নয় "স্বদেশী" সম্পত্তি। স্বর্গীয় বঙ্গপিতা বড় বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের জন্য এক উইল বা দানপত্র * লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার দানপত্রে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন পুত্রকে তাঁহার বিষয়ের সমান অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এই সাম্যভাবেই ৺বঙ্গপিতার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান যে কোন ভ্রাতারই প্রস্তুত হউক না কেন "স্বদেশী" দ্রব্যরূপ বিষয়ে তিন জনেরই সমান অধিকার অর্থাৎ স্বদেশীদ্রব্য ঐ তিনজনের মধ্যে যাহারই প্রস্তুত হউক না কেন তাহা বঙ্গবাসীগণের নিকট সমান ভাবে আদৃত হইবে। দানপত্রে ৺বঙ্গপিতা তাঁহার বিষয়সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইংরাজ রাজকে কার্য্যনির্ব্বাহক অধ্যক্ষ (executor) পদে বরিত করিয়া গিয়াছেন। তাই ইংরাজ-রাজ ভারতে যাহাতে স্বদেশপ্রস্তুত দ্রব্যের আদর হয় তাহার জন্য সকল উপায় করিয়া দিতে কর্ত্তব্য-বাধ্য।

৺বঙ্গপিতার পুত্র আমরা এখনো নাবালক। পিতৃবিয়োগের পরে স্বদেশরূপ মহা-সম্পত্তির গুরুভার আমাদের হস্তে এই নূতন পড়িয়াছে। আমাদের

* বাঙ্গলায় উইলের ঠিক প্রতিশব্দ নাই তাই 'দানপত্র'ই ব্যবহৃত হইল।

অধ্যক্ষবর ইংরাজরাজের সুবন্দোবস্তে আইস আমরা আমাদের 'স্বদেশী' সম্পত্তি পরিদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হই। তাহা হইলে আমরা পুরুষানুক্রমে "স্বদেশী" বিষয়ের (অর্থাৎ স্বদেশ-উৎপন্ন দ্রব্যের) আয় উপভোগ করিতে থাকিব। এইরূপে ক্রমে ইহাতে সম্পত্তিশালী হইয়া ৺বঙ্গপিতার নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা।

(জয়পুরী গল্প।)

একদা এক রাজকুমার মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক তড়াগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই তড়াগে একটী রজকপত্নী একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব সুচারু কারুকার্য্য বিশিষ্ট মাথার ওর্ণা কাচিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এ ওর্ণা যে রমণীর সে না জানি কত সুন্দর হইবে। তিনি রজকপত্নীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ বস্ত্রটী কাহার?' সে বলিল—"আমাকে বলিতে বারন আছে"। রাজকুমার তাহাকে কত ভয় দেখাইলেন, কত তাড়না করিলেন, কত কাকুতিমিনতি করিলেন কিন্তু তবুও সে বলিল না। তবে এইমাত্র সংকেতে বলিয়া দিল—"আমি এই বস্ত্র যাহার গৃহে লইয়া যাইব, জানিবে সেই গৃহে ইহার অধিকারিণী আছেন।" অনন্তর রাজকুমার তাহার সঙ্গ ধরিলেন। বাড়ি বাড়ি তাহার সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় রজকপত্নী একটী বণিকের বাঁড়িতে সেই বস্ত্রটী দিতে গেল। রাজকুমারের জানিবার কিছু বিলম্ব রহিল না। তিনি জানিতে পারিলেন যে বস্ত্রটী এই সহকারের কন্যার।

রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া "গোঁষাঘরে" * শুইলেন। রাজা ও রাণী তাঁহার মনোগত বাঞ্ছা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্বোক্ত সহকার কন্যার সহিত বিবাহ না দিলে তাঁহার প্রাণধারণ করা অসম্ভব। তাঁহারা তাঁহাকে কত বুঝাইলেন—"রাজপুত্র হইয়া কি প্রকারে নীচ বণিক কন্যা বিবাহ করিবে।" "সুন্দর রাজকন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।" কিন্তু তিনি কোনমতে বুঝিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা তাহাতেই মত দিতে বাধ্য হইলেন। রাজা সহকারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার কন্যার সহিত রাজপুত্রের' বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কন্যার কিন্তু বিবাহ করিতে অনিচ্ছা, সুতরাং সহকার বণিক এই আপত্তি করিলেন— "মহারাজ আমরা গরীব লোক, আপনার পুত্র রাজকুমারের সঙ্গে কিরূপে আমার কন্যার বিবাহ সম্ভব।" রাজা এ আপত্তি না শুনিলে—তিনি বলিলেন —"রাজপুত্রকে তবে আমার কন্যার নিকট পাঠাইয়া যাহাতে তাহার মত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে বলুন।"

রাজপুত্র সেই বণিকের সঙ্গে তাহার বাড়ী গেলেন। বণিককুমারীকে দেখিয়া তিনি একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। রাজকুমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বণিককুমারী বলিল—"এই যে আমার মাথার ওর্ণা চাদর দেখিতেছ ইহারই জোড়া সাত সমুদ্র পারে বৈজনী নাম্নী নগরে আছে—

কি দিব তুলনা? বৈজনী নগরী
ধরাতলে বৈজয়ন্তধাম
সুন্দর বিস্তৃত পাদপের শ্রেণী
স্বর্গের কল্পতরুসমান।
বিস্তারি সহস্র শাখা মনোহর
পথিকেরে করে ছায়াদান

---

* সেকালে রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটী করিয়া "গোঁষাঘর" থাকিত। রাজপুত্র বা রাজকুমারী প্রভৃতির মধ্যে যদি কাহারও কোন কারণে বিরক্তি বা ক্রোধ হইত ত "গোঁষাঘরে" গিয়া বসিয়া থাকিলে তাহা রাজার গোচরে আসিত এবং তাহা হইলে রাজা তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতেন।

বিহঙ্গ সহস্র বসি' তদুপরি
ঢালেরে সদা সুধার গান।

তুমি যদি এই বৈজনী নগরে গিয়া আমার চাদরের জোড়াখানি আনিতে পার তাহলে তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, নতুবা নয়।" রাজকুমার তাহাতেই সম্মত হইলেন।

কিন্তু সাত সমুদ্র পারে বৈজনী নগর—তাহা অতি দুর্গম এবং ভয়সঙ্কুল। সেখানে যাইবার উপায়? রাজকুমার তাহার জন্য ছদ্মবেশধারণ পূর্ব্বক বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে পথে এক সমাধিস্থ যোগী দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যোগী সমাধি ভঙ্গে সেবাপরায়ণ সেই রাজকুমারকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বর মাগিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি কি প্রকারে বৈজনী নগরে যাইতে পারি তাহারই উপায় করিয়া দিন।" যোগী বলিলেন—"সিদ্ধকার্য্য ঋষির সেবা কর, তিনিই উপায় বলিয়া দিবেন।" সিদ্ধকার্য্য ঋষি তাঁহার আশ্রয় হইতে এক যোজন দূরে তপস্যারত ছিলেন। রাজকুমার তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যথাসময় তিনি তাঁহাকে বর মাগিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"বৈজনী নগরে যাইবার উপায় বলুন।" ঋষি তখন তাঁহাকে একটী শুপারি দিয়া বলিলেন—"ডান হাতে এই শুপারিটী লইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবে, সেইখানেই যাইতে পারিবে।" তিনি শুপারি লইয়া বৈজনী নগর যাইব মনে করিলেন। নিমেষমাত্রে তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈজনী নগরে সকলেই সুখী—দরিদ্রের চিহ্ন নাই। সেখানে সকলেই সকলকে আত্মবৎ ব্যবহার করে। সেখানে কোন ঘরে কেহ তালাবন্ধ করে না। রাজপুত্র বৈজনী নগরে গিয়া তাই অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইতে বণিক কুমারীর শিরাবরণ ওর্ণা লইয়া শুপারিযোগে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইলেন। বস্ত্রটী লইয়া একেবারে বণিককুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বণিককুমারী বস্ত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং কি প্রকারে তিনি তথায় যাইতে পারিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রাজকুমার সমস্তই বলিলেন এবং শুপারীটা দেখাইলেন। বণিককুমারী শুপারিটী হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে সেই মুহূর্ত্তে বৈজনী দেশে পলায়ন করিল। রাজকুমার—

"হায় বণিককুমারী, হায় বণিককুমারী" করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। এবারও তিনি সিদ্ধকার্য্য ঋষির নিকট গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। যথাসময়ে আবার তিনি সেই ঋষির কাছে আর একটী গুপারি চাহিলেন। তিনি তাহাই দিলেন। আবার রাজকুমার বৈজনী নগরে গিয়া পৌছিলেন। বণিক কুমারীর মাথার চাদরখানি চুরি যাওয়াতে বৈজনী নগরবাসীরা বিদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। তাহা ছাড়া বণিককুমারীও বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে "যদি কোন মানব এদেশে আসে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও।" এবারে রাজকুমার সেখানে যাইবামাত্র বৈজনীবাসীরা তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে বণিককুমারীর নিকটে লইয়া গেল। বণিককুমারীর আদেশে তাঁহাকে একটী কুটীরে আবদ্ধ করা হইল। বণিককুমারী ইহাতে শাপমুক্ত হইয়া ইন্দ্রালোকে পূর্ব্ববৎ নর্ত্তকীর কার্য্য করিতে লাগিল। যে কুটীরে রাজকুমার আবদ্ধ ছিলেন তাহার একটী গুপ্তদ্বার ছিল। রাজকুমার রাত্রিকালে এই দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং দেখিলেন সম্মুখে একটী ঐরাবৎ হস্তী রহিয়াছে। তিনি হস্তীর সেবা করিলেন এবং হস্তী প্রসন্ন হইয়া তাহার খাদ্য হইতে তাঁহাকেও কিছু খাইতে দিল এবং বলিল—"তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমাকে আমি ইন্দ্রপুরী দেখাইব।" এই বলিয়া হাতী তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া ইন্দ্রপুরীতে গমন করিল। তৎকালে ইন্দ্র সভায় বসিয়াছিলেন আর পূর্ব্বোক্ত শাপমুক্ত বণিককুমারী স্বীয় নৃত্য নৈপুণ্যের দ্বারা ইন্দ্রসভা মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ছদ্মবেশে রাজকুমারও সেই নর্ত্তকীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। নর্ত্তকীর যে বাদক ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাজকুমার বার বার বলিতে লাগিলেন—"তুমি ভাল বাজাইতে পার না।" ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"তবে তুমি বাজাও।" রাজকুমার বাজনায় সুনিপুণ ছিলেন, তিনি বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাজনা শুনিয়া সমস্ত ইন্দ্রসভা যারপরনাই মুগ্ধ হইল এবং স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার গলা হইতে হার খুলিয়া নর্ত্তকীকে দিলেন। প্রথানুসারে নর্ত্তকী সেই হারগাছি বাদ্যকরের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। অবসর বুঝিয়া রাজকুমার এক্ষণে পূর্ব্ব বাদ্যকরের হস্তে বাদ্যযন্ত্র দিয়া স্বয়ং ঐরাবৎ পৃষ্ঠে চড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পর-

রাত্রে আবার বণিককুমারী ইন্দ্রসভায় চলিয়া গেলে রাজকুমার গুপ্তদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন এবং দেখিলেন এক পক্ষীরাজ ঘোড়া রহিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে বণিককুমারী এই অশ্বে করিয়া ইন্দ্রপুরে গমন করিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রে ঐরাবৎ হস্তীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। রাজকুমার উচ্চৈঃশ্রবার সেবা করিতে লাগিলেন। পক্ষীরাজ ঘোটক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাহার খাদ্য হইতে বখরা দিল এবং তাঁহাকে ইন্দ্রপুরে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইল। পূর্ব্ববৎ রাজকুমার নর্ত্তকীর পার্শ্বে বসিয়া বারবার তাহার বাদককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ভাল বাজাইতে পার না।" সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেই বাজাইতে দিল। এবার ইন্দ্ররাজ তাঁহার বাদ্যশ্রবণে এতদূর মোহিত হইলেন যে তাঁহার অঙ্গুরী লইয়া নর্ত্তকীকে দিলেন। নর্ত্তকীও তাহা প্রথানুসারে তাহার বাদকের অর্থাৎ রাজকুমারের হাতে দিল। রাজকুমার প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই পক্ষীরাজে চড়িয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রাতঃকালে বণিককুমারী ইন্দ্রসভা হইতে ফিরিলেন এবং আহারান্তে তাহার রাজকুমারের বিষয় স্মরণ হইল। তিনি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"দুই দিন হইল রাজকুমারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পানাহার সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বিস্মিত হইয়াছি। কি জানি রাজকুমার জীবিত আছেন কি না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আহার্য্য দ্রব্য লইয়া রাজকুমারের নিকট গেলেন। রাজকুমারকে জীবিত দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"আমি যে দুই দিন আপনাকে অনাহারে রাখিয়াছি তজ্জন্য আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি।" রাজকুমার বলিলেন—"আমি তো একদিন না একদিন মরিয়া যাইব। আজ তুমি আমার সঙ্গে পাশা খেলিয়া আমার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ কর।" বণিককুমারী তাহাতে সম্মত হইল। রাজকুমার পাশা খেলিতে খেলিতে নিদ্রার ভাণ করিলেন। তৎপরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাহাকে বলিলেন—"বণিককুমারী আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম যেন তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচিতেছ আর আমি বাদ্য বাজাইতেছি। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার অঙ্গুরীয় তোমাকে দিলেন, তুমি তাহা আমাকে দিলে।" এই বলিয়া পুনরায় পাশা খেলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার চক্ষু নিমীলিত করি-

লেন। আবার চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—"আমি আর একটী স্বপ্ন দেখিলাম। তুমি নাচিতেছ আর আমি বাজাইতেছি। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তোমাকে হার দিলেন। তুমি সেই হার আমার গলায় দিলে।" বণিককুমারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আমি যদি অঙ্গুরীয় ও হার তোমাকে দিয়া থাকি তাহলে তো আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু এ তোমার স্বপ্ন মাত্র।" রাজকুমার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া হার ও আংটি পরিয়া আসিলেন। বণিককুমারী বলিল—"তবে সত্যসত্যই আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তুমি গৃহে গমন কর, এক সপ্তাহ মধ্যে আমিও তোমার অনুসরণ করিব। এক সপ্তাহ আরও ইন্দ্রসভায় আমাকে থাকিতে হইবে।" তাঁহার হাতে একটী বাঁশী দিয়া বলিল—"এই বাঁশিটি লইয়া যাও। রাত্রি এক প্রহরের সময় বাজাইলে আমি খাদ্য লইয়া তোমার নিকট যাইব এবং এক ঘণ্টার জন্য নৃত্য সঙ্গীত দ্বারা তোমার মনোরঞ্জন করিব।" ইহা বলিয়া বণিককুমারী চলিয়া গেল এবং রাজকুমারও স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এক সপ্তাহ পরে বণিককুমারীর সহিত রাজকুমারের খুব ঘটার সহিত বিবাহ হইয়া গেল। রাজা ও রাণী পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

পদরাগ।

অনিত্য সবাই।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

নিত্য মরিতেছে লোক
নিত্য হাহাকার শোক
অহঙ্কার অভিমান যায়নাক তবু ;
ধনগর্ব্বে মাতামাতি,
উচ্চ নীচ কুল জাতি,
তুচ্ছ তমোভাব সংসারী ছাড়ে না কভু।
সুপণ্ডিত জ্ঞানভরে
রাশি রাশি তর্ক করে,
ধর্ম্মের করিয়া গ্লানি হৃদে সুখ পায় ;
কূটতর্কে নৈয়ায়িক
তাঁহারে মানেনা ধিক
দুবেলা উদর পূরি' যাঁর অন্ন খায়।
ক্ষণস্থায়ী এ সংসারে
চিরমায়া রেখোনা রে
কবে চলে যেতে হবে কিছু ঠিক নাই ;
ত্যজ বিদ্যা অভিমান
কর তাঁর গুণগান
তিনি বিনা এ জগতে অনিত্য সবাই।

দরশন দাও।

বেহাগ—মধ্যমান।

হৃদে দরশন দাও;
দূর কর সব গ্লানি, তোমার মধুর বাণী
অন্তরে শুনাও;
হৃদে দরশন দাও।
মোহদুর্গ কর চূর্ণ, ব্রহ্মতেজে কর পূর্ণ
সত্য বল দাও;
হৃদে দরশন দাও।
জ্ঞানালোকে অবিনাশ সুখনিদ্রা করি নাশ
জীবনে জাগাও;
হৃদে দরশন দাও।

ঝড়-উঠিয়াছে।

মেঘমল্লার—চৌতাল।

ঝড় উঠিয়াছে;
কেনরে ভাসালে তরী আশানদী মাঝে?
ঘোর ঘনঘটা;
চমকে চৌদিকে মোহিনী বিজলি ছটা;
কোথা যাবে হায়?
তরঙ্গের গ্রাসে তরী বুঝি ডুবে যায়;

যদি হবে পার
ডাক তাঁরে এক যিনি ভব কর্ণধার ;
যদি যাবে কূলে
দাও তাঁরে হাল যাও ভক্তি-পাল তুলে।

রয়েছি আনন্দে।

মালকোষ—ঢিমাতেতালা।

এত দুঃখ এত কষ্ট তবু রয়েছি আনন্দে ;—
শৈবাল পঙ্কিল জলে কমল ফুটেছে গন্ধে ;
মনোভৃঙ্গ পান করে পদরেণু মকরন্দে ;
প্রেমমধু সমীরণ বহিতেছে মন্দমন্দে ;
শত বাধাবিঘ্ন ঠেলি জীবন চলেছে ছন্দে।
কল্যাণ আশীষ তরে প্রভু তোমারেই বন্দে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও সাবিত্রীর সতীদাহ। *
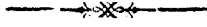
উনবিংশ শতাব্দীর কিশোর অবস্থায় বাঁশবেড়ে কুলীনদিগের প্রখর প্রতাপে দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কালে কৃষ্ণদেব চাটুর্য্যে বংশবাটীর মধ্যে প্রধান মর্য্যাদাশালী কুলীন ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে প্রায় ত্রিবেণীকুলস্থ বিশখানা গ্রাম থরহরি কম্প দিত। অথচ তিনি রাজাও না বাদশাহও না কিম্বা নবাবও না কি কোন উপাধিধারী ব্যক্তিও ছিলেন না। কেবল তিনি একজন সুকুলোদ্ভব গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মাত্র ছিলেন। তিনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি উদার ছিল। তাঁহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি একবার মাত্র যাহাকে দেখিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইতেন। দূরদূরান্তর হইতে লোকে তাঁহার নিকটে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিত। কোন কুলীনের তাঁহার অমতে বিবাহ দিবার যো ছিল না। চাটুর্য্যে মহাশয় অনেক লোককে কন্যাদায় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবারে তাঁহার নিজের পালা। দেখা যাক তিনি নিজে কি করেন।

কৃষ্ণদেব চাটুর্য্যের একটি মাত্র কন্যা আর দুইটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল। কন্যাটীর নাম ছিল সাবিত্রী। সাবিত্রীর জন্ম হইয়া অবধি কৃষ্ণদেবের ভাবনা কি করিয়া ইহার বিবাহ দিবেন। কৃষ্ণদেব মনে মনে সংকল্প করিয়াছেন যে, যে সে কুলীনের হাতে তাঁহার কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন না। তাই তিনি এই আট বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত পাত্রের অন্বেষণ করিয়া এতদিনে মনের মত পাত্র পাইয়াছেন। সাবিত্রী নয় বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। কৃষ্ণদেবের জামাই বেশ দেখিতে শুনিতে। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের খাজাঞ্চির কর্ম্ম করেন। ইহার নাম রামলোচন রায়। ইনি ইহার পূর্ব্বে আর দুইটি বিবাহ করিয়া তাহাদের কোথায় যে ফেলিয়া

---

* কৃষ্ণদেব চট্টোপাধ্যায় লেখিকার মাতামহের পিতামহ ছিলেন। সাবিত্রী তাঁহারি কন্যা।

রাখিয়া আসিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। ইহাকেও বিবাহ করিয়া এই যে চলিয়া যাইবেন আর দেখা হইবে কি না সন্দেহ।

রামলোচন বিবাহ করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে ক্রমে সাবিত্রীও তের বৎসরে পদার্পণ করিল। কৃষ্ণদেব তাঁহার জামাতাকে দিন দেখিয়া সাবিত্রীকে পতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য কতবার চিঠি লিখিলেন। জামাই সে চিঠির একখানারও উত্তর দিলেন না। ক্রমে কন্যা অধিক বয়স্ক হইয়া উঠিল; অহরহ চিন্তিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণদেব তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। একদিন সাবিত্রীকে বলিলেন "আয় মা তোকে আমি নিজেই তোর পতির কাছে দিয়ে আসি। তোর অত বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমি তো আর থাকিতে পারি না।" তারপরে তাঁহাদের যাইবার সমস্ত সরঞ্জাম গোছান হইলে পর, পরদিন ভোরে কৃষ্ণদেব সাবিত্রী ও একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে চলিলেন। দিন দশ বার পরে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মুর্শিদাবাদে রামলোচনের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন রামলোচন বাঁশবেড়ে হইতে আসিতে আসিতেই পথিমধ্যে আর এক বিবাহ করিয়াছেন, তাহাকেই ঘরে রাখিয়াছেন। তাহাতেই তাহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। তিনি বেশ সুখে আছেন তাই তাঁর কোন স্ত্রীর জন্য তিনি বিশেষ ভাবেন না।. কিন্তু এখন সাবিত্রীকে হাতের সামনে পাইয়াও রাখিয়া দিলেন। তারপরে সাবিত্রী আসিবার বছর আট পরে রামলোচন নবাবের কাছে দুই মাসের ছুটী লইয়া বাঁশবেড়ে অঞ্চলে পিতৃগৃহে চার স্ত্রী ও এক পুত্র সমভিব্যবহারে গেলেন। রামলোচন এখানে আসিয়া দুই মাস বেশ সুখেসচ্ছন্দে কাটাইলেন। তারপরে হঠাৎ একদিনে তাহার একটু বক্ষপীড়া হইল। ইহার দুইদিন আগে সাবিত্রীও তাহার পিতৃগৃহে আসিয়াছে। সেই জন্য কেহই এই সামান্য অসুখে তাহাকে আনা আবশ্যক মনে করিল না। পরদিন যখন অত্যন্ত অসুখ বাড়িল সকলে তাড়াতাড়ি সাবিত্রীকে খবর দিয়া পাঠাইল। সাবিত্রী শুনিয়াই আর কাহারো অপেক্ষা না করিয়া স্বামীর উদ্দেশে চলিলেন। হায় তাহার সহিত রামলোচনের আর একটিও কথা হইল না। জন্মের মত হইয়া গেল। এইবারে সাবিত্রী আর দুইজন স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত সহমরণ করিবেন। কনিষ্ঠার পুত্র রহিয়াছে

বলিয়া তিনি তাঁহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। এদিকে এই সময়ে লর্ড বেণ্টিক ও যত বড় বড় লোকে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আর কিনা এত বড় লোকের কন্যা সহমরণ করিবে শুনিয়া লর্ড বেণ্টিক কলিকাতা হইতে একজন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীকে দশ বারজন পুলিশের সহিত উহা নিবারণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদেব তো ইহা দেখিয়া ভয়ে অস্থির, কি জানি কি করে, পাছে জাতিভ্রষ্ট হয়। তাঁহার কন্যা তো কিছুতেই বুঝিবার লোক নহে। অবশেষে লর্ড বেণ্টিক নিজে আসিলেন ভাবিলেন যদি নিবারিত হয়। অনেক টাকার প্রলোভন দেখাইলেন, কত রকম বলিলেন তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। অবশেষে ইহারা জোর করিয়া সাবিত্রীকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও রামলোচনকে দাহ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের চারিদিকে পুলিশে পাহারা দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সাবিত্রী কি করিয়া যে বন্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল সকলে দেখিয়া অবাক। তিনি বাহির হইয়া আসিয়াই বলিলেন— "খবরদার আমার পতিকে দাহ করিও না যতক্ষণ না আমি বলিব।" কেহ সাহসও করিল না। তারপরে তিনি তাঁহার গহনা কাপড় বাসন টাকা ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া দাসী ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিলেন। তারপরে গঙ্গাস্নান করিলেন স্বামীকে করাইলেন ও তাহার আর দুইজন সতীনকে করাইলেন; সকলকেই তিনি নববস্ত্র পরাইলেন, সুগন্ধ দ্রব্যে ভরপূর করিলেন ও ফুলমাল্য স্বামীর গলায় দিলেন ও নিজেরাও পরিলেন, তারপরে বলিলেন "এখন আমাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ কর।" তাঁহার দুই সতীন পূর্ব্ব হইতেই মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের দুইপার্শ্বে শয়ন করাইয়া তিনি তাঁহার স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। অগ্নি ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তবু তাঁহার একটু বিকৃতভাব দেখা গেল না। সকলে দেখিয়া অবাক হইল। সতী স্ত্রী তাই স্বামীর সঙ্গেই যাইতে পারিলেন।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

———

রাগ ও ছবি।

চিত্রে যেমন নানাবর্ণের প্রয়োজন হয়, গানেও সেইরূপ নানা স্বর-বর্ণের আবশ্যক হইয়া থাকে। রাগরূপ চিত্রাঙ্কনের জন্য যেরূপ যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বর-বর্ণের প্রয়োগ সাধন করিতে হয় তাহা প্রাচীন ভারতের স্বরচিত্র-কবিগণ বিশেষরূপ জানিতেন। নানা স্বরবর্ণের সাহায্যে যথার্থ স্বরচিত্রাঙ্কনে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের কি প্রকার ক্ষমতা ছিল তাহা আমরা প্রথমতঃ এক 'রাগ' কথাটীর দ্বারা বুঝিতে পারি। রাগ কি? রাগের অর্থ কি? ভরত মুনি বলেন "রঞ্জনাৎ রাগঃ" কোনরূপে স্বরবর্ণ বিন্যাসের দ্বারা একটী ভাবরূপ ছবি রঞ্জিত করিয়া ফুটাইতে পারিলেই তাহা 'রাগ' হইল। দেখ প্রাচীন ভারতের স্বরচিত্রকবিরা কেমন চিত্রের ভাবে রাগের কল্পনা করিয়াছেন। মহর্ষি ভরতের পোষকতা করতঃ অপরাপর সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন :—

"যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ॥"

স্বরবর্ণ বিভূষিত হইয়া জনচিত্তের রঞ্জনকারী যে ধ্বনিবিশেষ তাহাই রাগ। পুনশ্চ 'রাগ' শব্দটীর মধ্যেও যেপ্রকার অকৃত্রিমতা দেখি, সেইরূপ রাগরাগিণীর চেহারায় অর্থাৎ ভাবেও অকৃত্রিমতা স্বভাবের সরল—সহজ ছবি দেখিতে পাই। চিত্রকর রঙের দ্বারা যেরূপ প্রকৃতি চিত্রিত করেন, সেই প্রকার হিন্দুসঙ্গীতাচার্য্যেরা স্বর-বর্ণের দ্বারা প্রকৃতির চিত্র আঁকিতেন। এক উষা ও সন্ধ্যার রাগরাগিণীর চিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে তাঁহাদের চিত্রাঙ্কন কতদূর সফল হইয়াছে। উষার রাগরাগিণীর স্নিগ্ধ কোমলত্ব রক্ষা করিয়া এবং সন্ধ্যার রাগরাগিণীতে সেই কোমলত্বের উপর কিঞ্চিৎ তীব্রতা মিশাইয়া আর্য্যেরা স্বরচিত্রাঙ্কনে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রং দিয়া উষা ও সন্ধ্যার ছবি আঁকিতে গেলে যে নৈপুণ্যের আবশ্যক সুরের দ্বারা উষা ও সন্ধ্যার ছবি আঁকিতে ঠিক সেইরূপ নৈপুণ্য ও স্বরবর্ণবিজ্ঞানতা

প্রদর্শন করিয়াছেন। ঊষা ও সন্ধ্যার ছবি দুইই দিবানিশির সন্ধিস্থলের ছবি। এই দুইটিকে তাহাদের সূক্ষ্মপার্থক্য বজায় রাখিয়া চিত্রিত করিতে গেলে ভালরূপ চিত্রবিজ্ঞানবিৎ হওয়া চাই। কি—একটুর জন্য, ঊষা ও সন্ধ্যা দুইই দিবানিশির সন্ধিস্থল হইয়াও পৃথক ভাবাপন্ন!—একটি প্রাতঃ সন্ধ্যা আর একটী সায়ং সন্ধ্যা। একটিতে প্রাতঃ সন্ধ্যার ভাব—স্নিগ্ধ মধুর কোমল ভাব, আরেকটীতে সায়ং-সন্ধ্যার ভাব—কিঞ্চিৎ তীব্রতা যুক্ত উভয়-বিধ সন্ধ্যার এই বিচিত্র. চিত্রবিজ্ঞান, আমাদের দেশের পূর্ব্ব সঙ্গীতকারেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইহেতু তাঁহারা ঊষার রাগরাগিণীকে প্রধানতঃ কোমল ভাবের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যার রাগরাগিণীর বেলায় কখনো তাহার কোমল ভাব কিঞ্চিৎ হ্রাস অথবা কখনো তাহাকে তীব্র ভাবের দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত করিলেন। স্বভাবের চিত্রাঙ্কনের বিজ্ঞানের অনুকরণ করতঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা রাগরাগিণীকে চিত্রিত করিতে যত্ন করিতেন—চিত্রবিষয়ে আর্য্যেরা রীতিমত অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা যতবার মনে ভাবি ততবার তাহা-দিগের ধন্যবাদ প্রদানে ইচ্ছা হয়—তাঁহাদিগের মার্গের একান্ত অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে অভিলাষ হয়। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা যেরূপ বর্ণপ্রয়োগ করিয়া থাকেন প্রাচীন ভারতীয় স্বরচিত্রকবিরাও উভয়বিধ সন্ধ্যার ছবিতে ঠিক সেইরূপ রং ফলাইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতেরা রাগ-রাগিণীর চিত্রউদ্ভাবনে কি অকৃত্রিম সারল্য ও সামর্থ্য দেখাইয়া গিয়াছেন!—তাঁহারা সরল মনে প্রকৃতি আলোচনা করিয়া সঙ্গীতের স্বরবর্ণের ছায়া দ্বারা তাহার নিখুঁত ছবি তুলিতেন।—তাঁহাদের রাগরাগিণীর স্বাভাবিকতায়—স্বাভাবিক ছবি দেখিয়া লোকের স্বভাবতই অনুরাগ উদ্দীপন করিয়া দেয়। ইহা সকলেই জানেন বোধ হয় যে যখন মেঘ বা মল্লার ঠিক গাওয়া যায়, তখন ঠিক একবারে বৃষ্টির ভাব মনে জাগিয়া উঠে। যখন ভৈরব রাগ আলাপ করিতে শুনি, তখন ঠিক ঊষার ভাবে হৃদয় অভিভূত হইয়া যায়, যখন শ্রী বা গৌরী বা পুরবী প্রভৃতি সন্ধ্যারাগিণী শুনি তখন কেমন সুন্দর সন্ধ্যার ভাব মনে জাগ্রত হইয়া উঠে।—কোন কোন ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরাও আমাদের রাগ শুনিয়া তাহাতে সন্ধ্যার ছবি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কত বিদেশীয় সঙ্গীত গুণীরা আমাদের আর্য্যসঙ্গীতের অকৃত্রিম প্রকৃতিগত ভাব

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

এজন্য হিন্দুস্বরচিত্রকরদিগকে মুক্তকণ্ঠে না প্রশংসা করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুবিখ্যাত স্বরকবি তানসেন এই স্বরচিত্রের বিজ্ঞানের যাথার্থ্য প্রকৃতরূপ বুঝিতেন। তাই তিনি দীপকদহন জ্বালা হইতে নিস্তার লাভের জন্য তাঁহার কন্যাকে মেঘমল্লার রাগ মূর্ত্তিমান করিয়া ভাল করিয়া গাহিতে বলিয়াছিলেন।—জানিতেন প্রকৃতির মেঘের মূর্ত্তির ন্যায় গানে যদি মেঘরাগ ফুটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে মেঘের বারিধারার মত সে মেঘরাগও বারিধারা নাবাইতে পারে—স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিতে পারে।

চিত্রের বর্ণসমূহের ন্যায় স্বর-বর্ণ সমূহের দ্বারাও চিত্রাঙ্কন করিতে পারা যায় এই বিষয়ে আর্য্যেরা কিরূপ বিজ্ঞানসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন তাহার অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়: প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বরসমূহের প্রত্যেককে এক এক বর্ণযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়া স্বরচিত্রাঙ্কনের যেন বৈজ্ঞানিক দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন—প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।—সা স্বরকে পদ্মাভঃ রক্তবর্ণ, রেকে পিঞ্জর অর্থাৎ ঈষৎ পীতবর্ণ, গাকে স্বর্ণবর্ণ, মা কুন্দকুসুমবৎ শুভ্র, পা স্বরকে কৃষ্ণবর্ণ, ধা স্বরকে পীতবর্ণ, নিখাদকে কর্ব্বুর অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন:

"পদ্মাভঃ পিঞ্জরঃ স্বর্ণবর্ণঃ কুন্দপ্রভোঽসিতঃ।
পীতঃ কর্ব্বুর ইতি .... ॥"

এ সম্বন্ধে বারান্তরে আরও বলিবার আছে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

কথালাপ।

বিদেশী কাক ও স্বদেশী কোকিল।

বাঙ্গালী বিদেশের খাইয়া বিদেশের পরিয়া মানুষ হইল। কাক যেমন কোকিলের ছানাকে মনে করে যে বড় হ'লে এ আমারি মত কাক হবে বিদেশীয়েরা সেইরূপ মনে করিয়াছিল যে, ক্রমে বাঙ্গালী তাহাদের পরিপোষণে তাহাদেরই মত চাল চলন শিখিবে—স্বদেশদ্রোহী বিধর্ম্মী হইয়া উঠিবে। কিন্তু বিদেশীর আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখিয়া বাঙ্গালী যেই উড়িতে শিখিল সেই স্বদেশী আমডালে বসিয়া বিদেশিয়ানা ও বিদেশী জিনিষকে সুমিষ্টস্বরে কু কু (কু = খারাপ) বলিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বদেশী রাজছত্র।

সচরাচর ছাতা আমাদের দেশে আজকাল যেরূপে প্রস্তুত হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ছাতার লৌহের দাণ্ডা ও ছাতার শিখগুলি সাধারণতঃ বিদেশ হইতে আনীত হয়। কাপড়টী কেবল আমাদের দেশের। এইরূপ ছাতাই বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের উপযোগী। কারণ আমাদের রাজা এখন বিদেশী। বিদেশী রাজত্বে আমাদের আবশ্যকীয় সকল জিনিষ দেশোৎপন্ন হইতে পারে না। দণ্ড (ছাতার দণ্ড) অর্থাৎ রাজদণ্ড বা শাসনদণ্ড বিদেশীই থাকিবে তদ্ভিন্ন উপায় নাই। এবং ছাতার লৌহ-শিখরূপ আমাদের শিক্ষাপ্রণালী তাহাও ইউনিভার্সিটি-লৌহনির্ম্মিত বিদেশীই থাকুক। নব্য বিদেশী রাজত্ব কালে একেবারে আমাদের বংশগত মনুর শাসনদণ্ড বা মনুর পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। উহা তাহা হইলে বংশদণ্ডে প্রস্তুত হোগলার ছাতার মত কদাকার দেখিতে হইবে। কেবল ছত্রের আচ্ছাদনটী যেন স্বদেশী স্বর্ণমণ্ডিত বস্ত্রে আবরিত হয়।

অর্থাৎ বিদেশী শিক্ষা প্রভৃতি আমরা যেন স্বদেশী ছাঁদে আবৃত করিয়া লই—যেমন জাপানীরা করিতেছে। এইরূপে স্বদেশপ্রস্তুত রাজছত্র আমরা রাজার মস্তকের উপর ধরিব। ইহাতে একমন্ত্রে আমরা রাজা ও স্বদেশ উভয়ের সেবক হইতে পারিব।

পারদ ও গন্ধক।

পারদ স্বভাবতঃ চঞ্চল। কবিরাজী মতে পারদের চাঞ্চল্য দূর করিতে—পারদকে মূর্চ্ছিত করিতে একমাত্র গন্ধকই সমর্থ। বঙ্গে পার্টিশনরূপ পারদ যে মহা চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছে, কেবল স্বদেশী গন্ধকে মর্দ্দিত হইলে সে চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে—পারদ মূর্চ্ছিত হইবে।

তাম্রপাত্রে বঙ্গ বা রাঙ্গের কলাই।

রাং ধাতুর সংস্কৃত নাম বঙ্গ। সকলেই জানেন যে তাম্রপাত্রে রন্ধনাদি করিতে গেলে বঙ্গ বা রাং দিয়া কলাই করিতে হয়। সমগ্র ভারত যেন তাম্র পাত্র। বঙ্গের দ্বারা উহা কলাই হইলে তবে তাহা কাজে লাগে (অর্থাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়)। বঙ্গের দ্বারা কলাই হইলে উহা দেখিতে রূপার মত হয়, কিন্তু প্রকৃত উহা রৌপ্য নহে। রৌপ্য হইতেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনজাতির মধ্যে যে রৌপ্যের স্থায়ী ঔজ্জ্বল্য আছে এই অধীন বঙ্গে তাহা থাকিতে পারে না। তবে বঙ্গ স্বাধীন-রৌপ্যের অনুকরণে উহার ক্ষণস্থায়ী রূপ ধরিতে পারে। আজ বঙ্গ যে বয়কট্‌ ও স্বদেশী ভাব প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে উহা স্বাধীনজাতির অনুকরণ—কলাই মাত্র। কলাই আপাততঃ দেখিতে রূপার মত হয় কিন্তু দুদিন বাদে উঠিয়া যায়। তাই কলাই করা দ্রব্য মধ্যে মধ্যে প্রায় ঝালাইয়া লইতে হয়। আমাদেরও বঙ্গের স্বদেশী ভাবের ঔজ্জ্বল্য রাখিতে চাহিলে মধ্যে মধ্যে ঝালান চাই।

বংশীধর লর্ড কর্জন ও বঙ্গ-রাধার বিরহ-জ্বালা।

ইম্পিরিয়ালিজমএর মোহন চূড়া পরিয়া ত্রিভঙ্গ * লর্ড কর্জন (কৃষ্ণ) বিলাতের সেক্রেটারী ব্রডরিক কদম্বতলে দাঁড়াইয়া কবিত্বের বংশী বাজাইয়া কি যে বিরহগীতি (পার্টিশনরূপ বিরহ) গাহিলেন তাহাতে বঙ্গ রাধা বিরহের জ্বালায় সারাক্ষণ দগ্ধ হইতে লাগিল। যদি সে সময়ে 'স্বদেশী' সখী না থাকিত তাহাকে সান্ত্বনা দান না করিত তাহা হইলে তাহার প্রাণ বাঁচান দায় হইত।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষে প্রার্থনা।

বিশ্বেশ্বর, আজ আমরা এই শুভদিনে, নববর্ষে এই গৃহে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তোমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমরা যেন বর্ষে বর্ষে তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য এইরূপ উপাসনা করিতে সক্ষম হই—আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের উপরে তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ যেন বর্ষিত হয়। যেমন নববর্ষে প্রত্যেকের মন উৎফুল্ল হয় তেমনি আমাদেরও মন যেন প্রেমানন্দে ভাসিয়া যায়। তুমি যে এত বৎসর ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে উন্নতির সোপানে লইয়া চলিয়াছ, কত বিঘ্ন বিপত্তি শোক দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়াছ, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে কোন

* ত্রিভঙ্গ কেন না ইনি তিনটী দেশকে ভাঙ্গিয়াছেন অর্থাৎ নবভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —(১) পঞ্জাবপ্রদেশ, (২) উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ ও বঙ্গপ্রদেশ।

কর্ম্মই করিতে সমর্থ নহি। তুমি বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যেক কর্ম্ম দেখিতেছ। সকল সময়ে যেন তোমাকে স্মরণ করি এবং পাপ তাপে হৃদয়কে মলিন না করিয়া আমাদের এই পাপময় জীবনকে প্রতিনিয়ত পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা পুণ্যময় করিতে সমর্থ হইয়া যেন তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে পারি। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রসাদে পুনরায় এই নব দিবস যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার চরণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। তুমি আমাদের মনে বিরাজমান থাকিয়া কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনরূপ পাপপঙ্কে নিপতিত না হই। আমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। তোমার সত্যস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া যেন প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্য করি। হে পরমাত্মন, তুমি আমাদের রক্ষক ও তুমি আমাদের সুহৃৎ। তুমি আমাদিগকে ভ্রম; প্রমাদ ও মোহ হইতে রক্ষা করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদন ও প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত কর। তুমি আমাদের পিতামাতাস্বরূপ, তুমি আমাদের সকল ভাব গ্রহণ কর ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

---

* বালীগঞ্জে নবগৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত।

বিশ্ব-বীণা।

দুর্জ্ঞেয় বাদক বসি অলক্ষ্যে একেলা
প্রদানিছে বিশ্ব-যন্ত্রে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
মুহুর্মুহু ত্রিভুবন করিয়া উতলা
হইতেছে কি অনন্ত রাগিণী সঞ্চার।
তালে তালে সুপর্য্যায়ে রবি-চন্দ্র-তারা
মোহন নর্ত্তনে রত বিরাট অম্বরে;
তালে তালে স্রোতস্বতী হয়ে আত্মহারা
নীলাম্বুর বক্ষে দেয় প্রেমাঞ্জলি ভরে!
প্রফুল্ল প্রসূনে আর প্রমত্ত পবনে,
বিহগের কলস্বরে, শ্যামল ধরায়,
অটল অচলে, উৎসে, নির্ঝরে, গহনে,
নিক্বণ-তরঙ্গ কিবা উঠিছে সদায়!
বাজে বীণা—প্রতিধ্বনি মধুর গম্ভীর
জাগিছে নির্জীব চিত্তে করিয়া অধীর!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

মাছের কোর্ম্মা।

খাগুপাক।

উপকরণ।—মাছ (রুই বা ইলিশ বা ভেটকি) আধসের, সরিষা তেল আধ পোয়া, পাটনাই পেঁয়াজ আধপোয়া, আদা আধতোলা, শুক্নালঙ্কা চারিটা, বড় রসাল কাগজিনেবু একটা, ঘি আধপোয়া, দই একপোয়া, ছোট এলাচ চারিটা, দারচিনি আধতোলা, লঙ্গ বারটা, নুন আধতোলার কিছু বেশী।

প্রণালী।—মাছটাকে খণ্ড খণ্ড কাটিয়া তাহাতে একটু নুন মাখিয়া সরিষা তেলে ভাজ। এক একবারে দুখানা করিয়া ভাজ। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ছয় মিনিট ভাজিতে লাগিবে।

পেঁয়াজ স্লাইস স্লাইস করিয়া কাটিয়া রাখ। আদা, লঙ্কা ও রসুন জল দিয়া বাঁটিয়া রাখ। এলাচ, দারচিনি ও লঙ্গ শুক্না গুঁড়াইয়া রাখ।

এইবারে ঘি আগুনে চড়াইয়া তাহাতে পেঁয়াজ-কুচা ছাড়। ক্রমাগত নাড়িতে থাক। মিনিট পাঁচের মধ্যে ভাজা ভাজা হইয়া গেলে খুন্তি দ্বারা ঘি হইতে পেঁয়াজকুচি উঠাইয়া রাখ। তারপরে সেই ঘিয়ে মশলা-বাঁটনা ছাড়। খুন্তি দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া নাড়িতে থাক। এক আধ মিনিট পরেই দই ছাড়। দই ছাড়িয়াও ক্রমাগত নাড়িতে হইবে, তাহা না হইলে হাঁড়িতে দই লাগিয়া যাইবে। একটু নাড়াচাড়ার পরে মাছ ছাড়। মাছগুলা উল্টাইয়া পাল্টিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দাও। নুন দাও। এখন হাড়ি নামাইয়া নেবুর রস দাও। ফের একবার চড়াও। ফুটিয়া উঠিলে নামাও। হাঁড়ি নামাইয়া তাহাতে গরমমশলাগুঁড়া ছড়াইয়া হাঁড়িটাকে খুব দোলাইয়া দাও—যাহাতে গরমমশলাগুঁড়া বেশ মিশাইয়া যায়। তারপরে সকলের শেষে পেঁয়াজভাজা ছড়াইয়া দাও।

ভোজন বিধি।—রুটী, লুচি, পোলাও ইত্যাদির সঙ্গে খাও বেশ লাগিবে।

শ্রীঃ দেবী।

কলঞ্জি।

হিন্দুস্থানি খাদ্যপাক।

উপকরণ।—চারিটি বা পাঁচটি বেগুন, তেল আধপোয়া, নুন এক তোলা, শুকলঙ্কা তিন চারিটি, মেতি আধ তোলা, কালজিরা আধ তোলা, রাই সিরষা দুই তোলা, আমচুর চারি তোলা।

প্রণালী।—বোঁটাসমেত বেগুন চারি চির করিয়া রাখ। উপরস্থ মশলা-গুলি একত্রে খুব মিহি করিয়া পিষিয়া রাখ। এইবারে চেরা বেগুনের ভিতরে ঐ পেষা মশলা ভর এবং সুতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখ।

এইবারে একটি কড়ায় তেল দিয়া আগুনে চড়াও। যখন তেল হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে থাকিবে তখন বেগুনগুলি ঐ তেলে ছাড়িয়া দাও, এবং একটি প্লেট বা একটি পাত্র উহার উপর চাপা দাও। মন্দা আগুন হইলে ভাল, বেশী আঁচ হইলে পুড়িয়া যাইবে। আধপোয়াটাক জল উহাতে দিবে, যখন জল মরিয়া তেল থাকিবে তখন বেশ ভাজা ভাজা করিয়া নামাইবে, যেমন করিয়া সচরাচর বেগুন ভাজে সেই রকম করিয়া ইহাও ভাজিতে হইবে। ভাজা হইয়া গেলে একটি বাসনে উঠাইয়া রাখ।

পেঁপের চাটনি।

খাদ্যপাক।

উপকরণ।—বড় কাঁচা পেপে একটি, তেঁতুলগোলা আধপোয়াটাক, চিনি এক ছটাক, নুন এক তোলা, তেল এক ছটাক, সরিষা দুয়ানিভর।

প্রণালী।—পেঁপেটীর খোলা ছাড়াইয়া উহাকে একটু ভাপাইয়া কুচিকুচি করিয়া রাখ।

আগুনে তেল চড়াও। যখন তেল হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে থাকিবে তখন সরিষাগুলি তেলে ছাড়িয়া দাও। যখন সরিষা ফুটিতে থাকিবে তখন পেঁপেকুচি ঐ তেলে ছাড়। দুই তিন মিনিট কষিয়া উহাতে তেঁতুলগোলা দাও ও আধপোয়া নুন ও চিনি দাও। একটু মাখ-মাখ থাকিতে নামাও। নামাইয়া একটি পাথর বাটিতে রাখ।

শুনেছি তোমার স্বর।

(সাংখ্যস্বরলিপি।)

মেঘমল্লার—সুরফাঁকতাল।

হে ঈশ্বর
শুনেছি তোমারস্বর,
অনন্ত আনন্দকর,
ভুলিব না তাহা কভু;
হে ঈশ্বর
ও স্বর অবিনশ্বর,
চির সুধার আকর,
ভুলিব না তাহা প্রভু।

তালি। ১: (স্থা, স্তু) । ২ । ৩ ॥
মাত্রা। ৪ । ২ । ৪ ॥

স্থাঃ—II র়ম়া রে মা২ রে২ মা । পা২ । পা৪ ।
স্থাঃ—II হে — — — — । ঈ । শ্বর্ ।

ধা সা ধা পা । পা২ । মপা মা মগা২ । গা
শু নে ছি তো । মার্ । স্ব — —র্ । অ

গমা রে রে । সরে২ । সা সা সা২ । রে মা
ন ন্ত আ । ন । ন্দ ক র । ভু

মা মা । পা২ । মা২ পা২ ধা পা পা II ॥
ব না । তা । হা — — ক ভু II ॥

(সুর :— মা পা নি২ । সা২ । সা৪ ।
(স্থ):— হে — — । ঈ । শ্বর ।

সা২ নি২ সা রে । রে২ সা২ রে । মগা২
ও — — শ্বর । অ — বি । ন

গা২ । গা গা গমা মা । মা২ । রমা রে
শ্বর্ । চি র সু ধা । —ব । অ —

সা সা । সা রে সা সা । সা২ । সরে
ক র । ভু লি ব না । তা । হা

সা সা । মা মা মা মা । পা২ । মা২
প্র ভু । ভু লি ব না । তা । হা

পা২ ধা পা পা । মা: ॥॥
— — প্র ভু । হে ॥।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।" জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর।

সূচী।

ডাঃ মাঃ সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৶৹ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিভাস্কর, শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর, শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার বি, এ, শ্রীসুষমা দেবী প্রভৃতি।

পুণ্য নিয়মাবলী।

১। পুণ্যের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা সহরে ৩৲ এবং মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৩।৶০। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

যাহারা এককালীন ৩৲ দিতে অসুবিধাজনক মনে করেন তাঁহারা মাসিক এক টাকা করিয়া ৩৲ পূর্ণ করিয়া দিলে আমরা লইতে প্রস্তুত আছি।

২। পুণ্য প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কেহ পুণ্য না পাইলে আমাদিগকে সেই মাসের মধ্যেই জানাইবেন, নচেৎ আমরা পুনরায় পুণ্য দিতে বাধ্য থাকিব না।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

হেমজ্যোতি।

নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত।

ইহাতে স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বৈদিক ইতিহাস সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক ব্রাত্যদিগের বিষয় এবং ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্রাদি এবং যাগযজ্ঞাদির বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও আছে।

উত্তম সোণারজলে কাপড়ে বাঁধাই—মূল্য ১৲।
পুণ্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা : ৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, "পুণ্য যন্ত্রে"
এবাদত আলি খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও পুণ্য কার্য্যালয় হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। *

কৌশল না থাকিলে জ্ঞানের চিহ্ন বুঝিতে পারিতাম না; এই লেখা দেখিয়া কি বলিতে পার, আপনাপনি লেখা বাহির হইয়াছে? লেখা দেখিলেই বোধ হয় একজন লিখিয়াছে। এই লেখা দেখিলে কি বোধ হয় যে আমি বিবেচনা না করিয়া বলিয়াছি, আর উনি বিবেচনা না করিয়া লিখিয়াছেন? তেমনি জগৎ-কৌশল দেখিয়া বোধ হয় কৌশলকর্ত্তা জগদীশ্বর সব তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

জড়বস্তু জ্ঞানবস্তু ইহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা দেখিলে, দূর নিকটের পরিচয় পাওয়া যায়। জড় হইতে জ্ঞান ভিন্ন, জ্ঞান হইতে জড় ভিন্ন, কিসে ভিন্ন, এইটী বুঝিলে দূর নিকটের পরিচয় হয়। জড়পদার্থ আর জ্ঞানপদার্থের বিভিন্নতার ভাব বুঝিলে, দূর নিকটের ভাব বুঝিতে পারিবে। জড়বস্তু জ্ঞান-বস্তু হইতে ভিন্ন, আর জ্ঞানবস্তু জড়বস্তু হইতে ভিন্ন, কিসে ভিন্ন, ইহা বুঝিলে তবে দূর নিকট বুঝিতে পারিবে, এক কথা থেকে আর একটা কথা ধরিতে পারিবে। জড়বস্তু যেমন একটা বই। জ্ঞানবস্তু কি? যেমন মানুষ। হাতটা জড়বস্তু কি জ্ঞানবস্তু? জড়। সব শরীরটা? শরীরটা জড়। হাত কি

* ২৪শে মাঘ ১৭৮৭ শক সোমবার ৯ ঘটিকা প্রাতঃকালে স্বর্গীয় পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

আপনাকে আপনি জানে? না। কে আপনাকে আপনি জানে? জ্ঞানের একটী লক্ষণ, যে অন্যকে জানে, এবং যে আপনাকে আপনি জানে। যে অন্যকে জানে না এবং আপনাকে আপনি জানে না সেই জড়। হাতটা পাটা আপনাকে আপনি জানে না, তাই তারা জড়। শরীর বলিলে তোমাদের একটু সন্দেহ হইল, শরীর হাত পা প্রভৃতি সব অঙ্গের সমষ্টি বই ত নয়। যদি জীবিত শরীরের প্রতি অঙ্গ আপনাকে আপনি না জানিল তবে সমুদয় শরীরটাই বা আপনাকে আপনি জানিবে কেমন করিয়া? আত্মাকে আপনি জানিতেছি। শরীর আত্মা মিশাইয়া একটা মানুষ হইল, শরীর নাই কেবল আত্মা,—আর মানুষ রহিল না। আত্মা নাই মৃত শরীর আছে সেও মানুষ থাকিল না। যখন হাতটা বলিব, হাতটা ভাবিবে শরীর ত ভাবিবে না, হাতটা বলিলে হাত না ভাবিয়া শরীর ভাবিলে, হাতটার জ্ঞান ত হইল না, তেমনি আত্মা বলিলে যদি শরীর আত্মা দুইকে মিশাইয়া ভাব, তবে ত আত্মাকে জানিলে না। আত্মা বলিলে যখন কেবল আত্মাকেই জানিবে, শরীরকে না, তখনি আত্মার জ্ঞান হইল। যদি বলি 'আলোটা ল'য়ে এস' তবে প্রদীপ তেলশুদ্ধ সবটা লয়ে এলে, যদি বলি 'কেবল আলোটা দেখাও' তাহা হইলে কেবল আলোটাই দেখাইতে হইবে তখন আর প্রদীপ তৈলসমেত দেখাইবে না, যদিও তাহাদের অবলম্বন করিয়া আলোটা আছে। তেমনি যখন জিজ্ঞাসা করিব 'কে আপনাকে আপনি জানে?' তখন কেবল আত্মাকেই দেখাইতে হবে, এইটুকুই আপনাকে আপনি জানিতেছে; শরীর যেন তৈল শলিতা ইত্যাদি রহিয়াছে তাহার আগুন জ্বলিতেছে আত্মা। আলো কি? জ্ঞান আলো। আলো যেমন স্বপ্রকাশ, আপনার আলোতেই আলোককে জানা যায় যেমন আলো আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, আবার প্রদীপকে দেখাবার জন্যও সেই আলো চাই, তেমনি আত্মা আপনাকেও জানিতেছে, আবার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাত পাকেও জানিতেছে—হাত পাকে আপনা হইতে পৃথক জানিতেছে বলিয়াই আপনাকে জানিতেছে। শরীরের ভিতর যেটুকু আপনাকে আপনি জানে না সেইটুকু অনাত্মা। আত্মার সঙ্গে তুলনায় অনাত্মা জড়বস্তু। আত্মা আমি আর অনাত্মা আমি না। আমি না কোন্ গুলা? হাত, শরীর, চোখ এই সব। আমি আত্মা। আত্মাকে যদি হাত দিয়া

ধরিতে যাওয়া যায়, কিছুই থাকে না। আত্মাটা কেবল ভিতরে যে আলোটা জ্বলিতেছে। শিরা জড়বস্তু, মেদ জড়বস্তু, মস্তিষ্ক জড়বস্তু হৃদয় জড়বস্তু, রক্ত জড়বস্তু, শরীর জড়বস্তু, মাথার চুল অবধি পায়ের নখ পর্য্যন্ত সকলি অনাত্মা, ভিতরে আত্মা আপনা আপনি জ্বলিতেছে। দুটা লইয়া মানুষ—শরীর ও আত্মা, শরীর জড়, আত্মা জ্ঞান; মানুষ বলিলে দুই বুঝায়, আত্মা বলিলে আর সব ছাড়িয়া দিয়া শরীরের ভিতর যেটুকু আপনাকে আপনি জানিতেছে, সেইটুকু আসিবে।

জড়বস্তু আর জ্ঞানবস্তুর বিভিন্নতা দেখিলে, দূর নিকটের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানবস্তুর লক্ষণ যে আপনাকে আপনি জানে, জড়বস্তুর লক্ষণ যে অন্যকে জানে না এবং আপনাকে আপনি জানে না—জ্ঞানকে ভাব করিয়া অভাব দিলাম জড়ের উপর, এবার জড়কে ভাব করিয়া অভাব দিব আত্মাকে। জড়মাত্রের বিস্তৃতি আছে, ইহাই হইল জড়ের অন্বয় গুণ, মনে কর সরিষা উহা সরিষা-সমান আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাকে আবার যতটুকু ভাগ করিবে, প্রত্যেক ভাগ আপনার অনুরূপ আকাশে থাকিবে, যদি চোখে দেখিতেও না পাই, তবুও মনে করিতে পারি তাহার বিস্তৃতি আছে, সে যতটুকু ততটুকুই তাহার বিস্তৃতি, এই এক, আবার ইহার অভাব লও জ্ঞানেতে, জ্ঞানবস্তুতে বিস্তৃতি নাই, জ্ঞানবস্তুর অন্বয়গুণ হইল আপনাকে আপনি জানে, ব্যতিরেক হইল আপনাকে আপনি জানেনা; জড়ের অন্বয় হইল বিস্তৃতি, ব্যতিরেক-বাচক হইল জ্ঞান নাই। যদি আত্মাকে মনে কর সরিষার মত, তবে আত্মার ভাব বুঝিতে পার নাই, যদি সূর্য্যকে মনে কর সে আপনাকে আপনি জানিতেছে, যদি শরীরকে মনে কর আপনাকে আপনি জানিতেছে তবে জ্ঞানের ভাব বুঝ নাই। আত্মা আপনাকে জানে, জড় জানে না। জড়ে বিস্তৃতি আছে, জ্ঞানে বিস্তৃতি নাই—ইহাই একটা সার কথা। জড়বস্তু আছে অথচ বিস্তৃতি নাই এমন কি হইতে পারে? বিস্তৃতি কি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে? আকাশ। সরিষা সরিষাপরিমাণ আকাশেই থাকে। আকাশে নাই এমন জড়বস্তু থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি যে বস্তু তাহা দীর্ঘও নহে হ্রস্বও নহে। বিস্তৃতি হইলে আকৃতি হইবে তাহা হইলে তাহার তিন পরিমাণ (Dimension) হইবে, লম্বা হইবে, চওড়া হইবে পুরু হইবে। জড়ের যে

একটা গুণ যে তাহা আকাশে থাকিবেই থাকিবে, তাহা আত্মায় নাই, আত্মার গুণ চেতনা, জ্ঞান জড়বস্তুতে নাই। জড় অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞান আলোকের তুল্য।

এই জড় আর জ্ঞান কাহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে? প্রথমে দেখা যাক, আশ্রয় আর আশ্রিত কাহাকে বলে? এই ঘড়িটা দেখা যাইতেছে আশ্রিত, ইহা যাহার উপর আছে তাহা উহার আশ্রয়। টেবিলের উপরে বই রহিয়াছে টেবিল হইল আশ্রয়, বই আশ্রিত। সেইরূপ বই টেবিল ও বাহিরের যত কিছু জিনিষ সকলই আকাশে আশ্রিত। টেবিলের উপরে যে বই আছে, সে বই যেমন টেবিলের ততটুকু আয়তন, ততটুকু স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে যতটুকু তাহার নিজের আয়তন—বড় বই অধিক স্থান গ্রহণ করে ছোট বই অল্প স্থানে থাকে, সেইরূপ যে জিনিষ যত বড়, সে জিনিষ আকাশের মধ্যে তত বড় আয়তন গ্রহণ করে। আকাশ অনন্ত, ইহার মধ্যে সকল আয়তনের জিনিষ থাকিতে পারে। আকাশ না থাকিলে কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মার বাহিরে আকাশ, আকাশের অতীত আত্মা। আমাদের চক্ষে যে কোন বস্তুর ছবি পড়ে আমরা জানি যে সেই ছবির কারণ উহা আত্মার বাহিরে আছে এবং আকাশে আছে। আত্মা আপনার পরমেশ্বরদত্ত স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা আপনার বহিস্থিত আকাশেই জড়বস্তুকে জানিতেছে। যদিও চক্ষুতে কেবল বাহিরের বস্তুর রূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহাতে আকাশ অর্থাৎ আয়তন সংযোগ করিয়া জড়বস্তুতে না ভাবিলে থাকিতে পারি না; ইহা এতদূর স্বাভাবিক যে মনেই করিতে পারিব না যে রূপই কেবল আছে বিস্তৃতি নাই, আমরা ইচ্ছা করিলেও আমাদের ইচ্ছা ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ঈশ্বর আত্মাতে এরূপ স্বাভাবিক শক্তি দিয়াছেন যে বাহিরে আকাশকে বাস্তবিক অবলম্বন করিয়া যে জড়বস্তু রহিয়াছে সে আকাশ অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা না দেখিয়াও সহজ জ্ঞান দ্বারা জড়বস্তুর আশ্রয় ও গঠনরূপে আকাশকে আপনার বাহিরে সহজেই জানিতেছে, আবার ইহার দ্বারাই জানা যাইতেছে যে আত্মা আর আকাশে নাই। যে আত্মা বাহিরের বস্তু দেখিয়া আপনার জ্ঞানপ্রভাবে আপনা হইতে বাহিরে, বাহিরের বস্তুরই আধার বলিয়া

আকাশকে জানিতেছে, সে আকাশ আবার আত্মার আধার কিরূপে হইবে? আকাশ এক আত্মার বোধেতে বোধরূপে আছে, এক জড়বস্তুর আশ্রয়রূপে বাহিরে আছে, অতএব জানা যাইতেছে যে আকাশের কেবল বাহিরের বস্তুর সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে, আত্মা নিজে তাহার অতীত, আত্মার সঙ্গে আকাশের কোনই সম্বন্ধ নাই। আকাশ কেবল বাহিরের বস্তুরই গঠন—ঈশ্বরের কেবল জড়জগতের রচনার স্থান এই আকাশ। আত্মার বাহিরেই আকাশ আরম্ভ, আত্মা নিজে অনাকাশ।

আকাশ যদি আত্মার আশ্রয় না হইল, তবে এই পরিমিত আত্মা কোথায় কাহার আশ্রয়ে রহিয়াছে? পরমাত্মার উপরে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা রহিয়াছে। যেমন অনন্ত আকাশে জড়বস্তু সকল ঘূর্ণিত হইতেছে, তেমনি অনন্ত পরমাত্মাতে জীবাত্মা সকল স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে। যেমন পরমাত্মা আকাশের ভাবে জড়বস্তুকে গঠন করিলেন, তেমনি আপনার ভাবে জীবাত্মা সকল সৃজন করিলেন। আত্মাতে পরমাত্মাতে আকাশেরও ব্যবধান নাই। শরীরের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে পরমাত্মা তাহার মূল। গাছ বলিলে দুই আসিবে, গাছ ও তাহার মূল; জড় বলিলে আকাশের সঙ্গেই জড়বস্তু আসিবে, তেমনি জীবাত্মা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরমাত্মা আসিবেন। যদি পরমাত্মা নাই বলি, জীবাত্মা আপনাপনি থাকিতে পারে না, কেহই থাকিতে পারে না। আত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন সৌর-জগতের মধ্যস্থানে সূর্য্য, এবং ঐ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহসকল ঘুরিতেছে, ঘূর্ণিত গ্রহকে জানিলেই জানিতেছি সে গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, আবার ঐ সূর্য্যকে দেখিলেই জানিতেছি, সে আর এক সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তেমনি জানিতেছি জীবাত্মা শরীরের মধ্যস্থান, আবার জীবাত্মার মধ্যস্থান পরমাত্মা। যখন আমরা স্পন্দযুক্ত শরীরকে দেখিতেছি তখনি জানিতেছি যে শরীর জীবাত্মা দ্বারা জীবিত, জীবাত্মার বলেই পরমাণুপুঞ্জের বিয়োজন প্রতিহত হইতেছে। যখন শরীরের কার্য্য দেখি, তখন জীবাত্মার ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়, কার্য্যোদ্যত শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোগী জীবাত্মা প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্য আমরা মানুষের শরীর ভাবিলে জীবাত্মাকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয়। আমরা মনে করিতেছি জীবাত্মা, পরমাত্মা তার সঙ্গে সঙ্গে

আসিতেছেন। শরীরকে যেমন চক্ষে দেখি তেমনি যদি জীবাত্মাকে দেখিতে চাই তবে জীবাত্মাকে দেখিতে পারি না। মানুষ বাহির ও ভিতর লইয়া; কেবল ভিতর দেখিলে আত্মা, আবার শুদ্ধ আত্মা নয়, আত্মার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মা দেখ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ যে কিরূপ, ইহা বুঝাইবার জন্য এক দৃষ্টান্ত দিই; পরমাত্মা যেন তলওয়ার, আত্মা যেন তাহার খাপ ও এই শরীর যেন তাহার সিন্দুক। খুব ভাল তলওয়ার হইলে তাহাকে খুব ভাল খাপে রাখিতে হয়। আত্মা নির্ম্মল হইলে খাপের ভিতর হইতে পরমাত্মাকে দেখা যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত: যেমন নিচুফল, তাহার উপরের খোসাটা ফেলিয়া দিলেই একটা পাতলা খোসা বাহির হয়, সেইটা ফেলিয়া দিলেই প্রার্থনীয় ফলটা দেখিতে পাই, তেমনি শরীর পরদা, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম পরদা আত্মা, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই প্রার্থনীয় পরমেশ্বরকে আবরণমুক্ত দেখিতে পাই। শরীরের আশ্রয় হইল আকাশ, আত্মার আশ্রয় হইলেন পরমাত্মা, সুতরাং আত্মার সহিত পরমাত্মার দূর নিকট সম্বন্ধ নাই। জড়বস্তুর পরস্পরের সহিত দূর নিকট সম্বন্ধ। জড়বস্তু পরস্পর হইতে দূর নিকট হইবেই। দূর হইলেই নিকট হবে, নিকট হইলেই দূর হবে। জড়বস্তু সকল পরস্পরের সহিত পাশাপাশি বা আড়াআড়ি রহিয়াছে। জড়পদার্থের যেমন বিস্তৃতিগুণ আছে, তেমনি তাহার অভেদ্যগুণ আছে; একটী জড়পদার্থ একটী আকাশকে ব্যাপিয়া থাকিলে, তাহাকে না সরাইয়া তাহাকে দূর না করিয়া আর একটী জড়পদার্থ সেই আকাশে কিরূপে থাকিবে? জড়পদার্থের অভেদ্যগুণ বলাতে এই অর্থ হইল যে, দুই জড়বস্তু একই সময়ে একেবারে একত্রে বা এক আকাশে থাকিতে পারে না। সুতরাং জড়পদার্থ ইহার চেয়ে উহা দূরে, উহার চেয়ে ইহা দূরে আছে। জীবাত্মার বিস্তৃতি নাই, পরমাত্মার বিস্তৃতি নাই যেহেতু দুই জ্ঞানপদার্থ। তাহাদের দূরই বা কি নিকটই বা কি? যদি আকাশের সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলেই দূর নিকট হয়। জ্ঞানবস্তুর লক্ষণ যে আকাশে নাই। যদিও বলিতেছি যে এই দালানে একত্র বসিয়া আছি, তথাপি পরস্পর পরস্পর হইতে দূর, যেহেতু শরীর লইয়া কথা হইতেছে; প্রতি শরীরই আকাশে আছে। জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, আকাশে নাই—পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আপনাতে আপনি রহিয়াছে। প্রতি জীবাত্মার বাহিরেই

আকাশের আরম্ভ। পরমাত্মাতেও শরীর নাই, তবে পরমাত্মাতে জীবাত্মাতে দূর নিকট সম্বন্ধ কি ?—একেবারেই একত্র আছেন ; জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে আকাশের সম্বন্ধ নাই, দূর নিকট যে আকাশের সম্বন্ধ আত্মা পরমাত্মাতে এ প্রকার কিছু বলিতে পারিবে না। তাঁহারা একত্র, তাঁহাদের মধ্যে নিকট দূরের সম্বন্ধ নাই, এক জায়গায়ই আছেন ; এখানে জীবাত্মা, ওখানে পরমাত্মা এ কথা বলিতে পারি না, এখানেই জীবাত্মা এখানেই পরমাত্মা। যেমন জড়-বস্তুতে জড়বস্তুতে দূর নিকট সম্বন্ধ আছে, তেমনি জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে দূর নিকটের সম্বন্ধ নাই। আবার শরীরেতে আত্মাতে যেমন দূর নিকট করিতে পারি না—হাতে জীবাত্মা নাই, পায়ে আছে এমন বলিতে পারি না, একই জীবাত্মা শরীরের সকল স্থানেই আছে, তেমনি পরমেশ্বর সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, পরমেশ্বরকে এরূপ বলিতে পারি না যে এই জায়গায় আছেন ও জায়গায় নাই। জীবাত্মা যেমন সকল শরীরে ব্যাপ্ত আছেন, পরমাত্মা সেইরূপ সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন কিন্তু যদি আকাশে তাঁহাকে দেখ তবে তোমার সম্বন্ধে দূরে তাঁহাকে দেখিলে। আত্মাতে তাঁহাকে দেখাই খুব নিকট দেখা। ঈশ্বরকে আত্মাতে দেখিবে—খুব নিকটে। তুমি যেমন এই নিকটে আছ জানিতেছি, সেইরূপ পরমেশ্বরকে জানিতেছি, তিনি, তুমি যেখানে রহিয়াছ ওখানেও আছেন, আবার আত্মার ভিতরে ও আত্মার পরমান্তরাত্মারূপে আছেন —মনের কল্পনারূপে মনের কেবল বোধমাত্ররূপে নেই কিন্তু বাস্তবিক আছেন, আমি তোমার মনকে মনে করিলেই তোমার মনটা আমার ভাবিবার মধ্যে আসিল, মনন দ্বারা তোমার মন আমার মনের মধ্যে আসিল, তেমনি আমার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে ভাবিতেছি বলিয়া ঈশ্বর যে কেবল আমার বোধেতে আছেন তাহা নয়, তিনি বাস্তবিক আছেন সত্যসত্য আছেন। জীবাত্মা যেমন সত্য, স্বপ্ন নয়, তেমনি জীবাত্মার আশ্রয় যিনি তিনি সত্য বাস্তব ; তাঁহাকে দেখিবার জন্য অন্তরে অন্বেষণ কর, তিনি অন্তরের অন্তরাত্মা।

ঈশ্বর দূরেও আছেন নিকটেও আছেন। যখন তাঁহাকে দেখি শরীরে আছেন তখন দূরে আছেন, যখন মনে করিব আত্মাতে আছেন, তখন নিকটে দেখিব। দশ পা চলিয়া গেলাম, আর, এক পা চলিয়া গেলাম—দুই দূর ; আপনা হইতে দূর আরম্ভ হয়। আত্মা হইতে শরীর দূর, জড়বস্তু দূর, কিন্তু পরমাত্মা

নিকটেই আছেন, তাই বলিয়া তিনি দূরে নাই একথা বলিতেও পারি না। তিনি দূরেও আছেন নিকটেও আছেন। এত নিকটে যে তিনি আত্মাতেও আছেন। পরমাত্মা দুই জায়গায় আছেন—এক আত্মাতে, এক আকাশে, অন্তরে আর বাহিরে। ইহা ছাড়াও আবার পরমাত্মা আপনাতেই আছেন। বাহিরে কিনা আকাশে শরীর আছে আত্মা নাই—আত্মা থেকে আকাশ বাহিরে। আত্মা আকাশে নাই কেন? আত্মার বিস্তৃতি নাই বলিয়া, আকাশ জড়বস্তুরই কেবল গঠন বলিয়া। আত্মা যখন জড়বস্তুকে দেখে তাহাকে আকাশেই দেখে, কিন্তু আপনাকে তো সে সময়ে আকাশে দেখে না। প্রতি শরীর কতকটা আকাশ লইয়া আছে, কিন্তু আত্মা আকাশে নাই। শরীর আছে বলিলে আকাশ মনে করিতেই হইবে, আত্মা আছে বলিলে আকাশে আত্মাকে ভাবিতেছি না, কেবল জানিতেছি আপনাকে মাত্র।

এক রকম বাহিরের এক রকম অন্তরের। বাহিরের হইল আকাশ, অন্তরের হইল আত্মা। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন আত্মাতেও আছেন। আকাশের মধ্যে শরীর, তাঁহাকে শরীরে দেখিলেও দূর করিয়া দেখা হয়, তাহাতেও আত্মার ভয় ঘুচে না,

"যদৈবমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ন্তবতি"

যে তাঁহাকে এক বিন্দুও অন্তর করিয়া জানে তাহার ভয় হয়। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরে অন্বেষণ করিলে হয় না, তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরাত্মা। তিনি অন্তরের মধ্যে আছেন, আত্মার মধ্যে আছেন।

স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়গান।

বেহাগ—মধ্যমান।

আর থাকিয়োনা বসে’
ধনমান দর্পচূড়ে,
প্রেমের মঙ্গল শঙ্খ
বাজিয়াছে বিশ্ব জুড়ে;
ছাড় বিলাসের গেহ
আঁধার মলিনপ্রাণ,
বিষম সন্দেহ দূরি’
নিত্য কর সমুত্থান।
ছুটিয়াছে দেখ ওই
সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা,
লোকে লোকে সকলেই
প্রেমভাবে আত্মহারা;
একতার পথে চল
ধরি সবে হাতে হাত,
গাও তাঁর জয়গান
যিনি আদি বিশ্বনাথ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দক্ষিণ ও বাম।

আমাদের বাহুদ্বয়ের গঠনে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। এই বৈসাদৃশ্য কেবলমাত্র যে বাহুদ্বয়ের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে। দক্ষিণ এবং বামাংশস্থ প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যেই এই বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় বামবাহু দক্ষিণবাহু অপেক্ষা খর্ব্বকায় কি না, এই তর্ক উপস্থিত হইয়া আমাদের সন্দিগ্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু বাস্তবিক বামাংশস্থ প্রত্যেক অঙ্গ দক্ষিণাংশস্থ প্রত্যেক অঙ্গ অপেক্ষা খর্ব্বকায়। সকলেই জানেন বামপদস্থ পাদুকা দক্ষিণপদে পরিধান করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ প্রয়াসসাধ্য হয়, কিন্তু দক্ষিণপদস্থ পাদুকা বামপদে অনায়াসে পরিহিত হইতে পারে। তাহার কারণ দক্ষিণ পদ বৃহত্তর। এই প্রকার দক্ষিণ হস্তও। এমন কি মস্তকের দুই পার্শ্বস্থ কেশও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। আমরা নিজ দেহস্থিত সমুদয় অঙ্গের মধ্যে হস্তদ্বয়কে মনোনীত করিয়া দিবানিশি অধিকাংশ কার্য্যে তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করি। এই হস্তদ্বয়ের মধ্যেও আমরা আবার বিশেষ করিয়া দক্ষিণ হস্তকে শ্রেষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করিয়াছি। আমরা দক্ষিণ হস্তের উপর এতটা নির্ভর করি, যে, কোন বন্ধুকে দক্ষিণহস্ত নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে না বসাইলে সন্তুষ্ট হই না।

ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণহস্তই সর্ব্বস্ব। সকল ক্রিয়াকর্ম্ম, দানগ্রহণ ব্রাহ্মণেরা সকলি দক্ষিণহস্তে সম্পন্ন করিতেন।

বামুণ বাদল বাণ
দক্ষিণে পেলেই যান ॥

ব্রাহ্মণ পুরোহিত যজ্ঞ করিবেন, আশীর্ব্বাদ করিবেন, সকলি দক্ষিণ হস্তে। শিষ্যেরা দান দিবেন তাহাও দক্ষিণহস্তে—তাই দানের আরেক নাম দক্ষিণা। আমরা কথায় বলিয়া থাকি "দয়াদাক্ষিণ্য"। এই দাক্ষিণ্য শব্দ 'দক্ষিণ' হইতেই আসিয়াছে। এমন কি পরস্পরের মধ্যে অভ্যর্থনা এবং আশীর্ব্বাদাদি

দক্ষিণহস্ত ভিন্ন অন্য হস্তে করা নিয়ম-বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। এখন বাহু-দ্বয়ের পার্থক্যের কারণ প্রদর্শিত হইলেই, অন্যান্য অঙ্গেরও বিভিন্নতার কারণ সুস্পষ্টরূপে জানা যাইবে।

দৈহিক যন্ত্রের তারতম্যই এই পার্থক্যের কারণ। দেহের বহির্ভাগ দেখিয়া আভ্যন্তরিক অবস্থা বোধগম্য করা সুকঠিন। বহির্ভাগের ইন্দ্রিয়সমূহ দেহের দুইদিকে ঠিক সমভাবে সমাকারে সৃষ্ট হইয়াছে: যথা—চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ইত্যাদি। কিন্তু আভ্যন্তরিক যন্ত্রপ্রণালী একেবারে বিপরীত। দৈহিক-যন্ত্র দৈহিক অঙ্গের ন্যায় দুই সমাংশে বিভক্ত নয়। কোন যন্ত্রের বামভাগে, কোন কোন যন্ত্রের বা দক্ষিণাংশে স্থিতি; আর কোন যন্ত্র বা দুইদিকে সমভাবে স্থিতি করিতেছে। এই অসম-স্থিতির জন্য দুইদিকের বলের ন্যূনাধিকা হইয়াছে। দক্ষিণদিকস্থ যকৃৎ এবং বামদিকস্থ প্লীহা প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় দুইদিকে অবস্থিত অথচ যকৃৎ প্লীহার অপেক্ষা সতেজে অধিক কার্য্য করে। আবার হৃৎপিণ্ড বক্ষের বামদিকে অবস্থিত রহিয়াছে; বস্তুতঃ হৃৎপিণ্ডের সমস্ত ভার বামদিকে থাকাতে বামহস্তের কার্য্যক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে, এবং সেই পরিমাণে দক্ষিণবাহুও সতেজ হইয়াছে। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কার্য্যানুসারে বহিঃস্থ ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়। কোন বাষ্পীয় পোতের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিসংযোগ না করিলে তাহার যেমন আর চলিবার ক্ষমতা থাকে না, মনুষ্য দেহও ঠিক এই প্রকার। অভ্যন্তরের যেদিক সবল সেই দিকের ইন্দ্রিয়েরাও বলশালী হয়। এই কারণে দক্ষিণবাহু বামবাহু অপেক্ষা বলবান এবং আমরা স্বভাবতঃ সকল কার্য্যেই দক্ষিণবাহুকে প্রেরণ করিয়া থাকি। কেবল মধ্যে মধ্যে বামবাহু দক্ষিণবাহুর সহায়তা করে মাত্র। যেমন লিখিবার সময় কাগজ কিম্বা পুস্তক বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে লিখিতে হয়। প্রধান কার্য্যে একমাত্র দক্ষিণহস্তই অগ্রগামী হয়। সংস্কৃতে বাম অর্থেই "কার্য্যের প্রতিকূল" আর দক্ষিণ অর্থেই "কার্য্যের অনুকূল"

"দক্ষিণোঽনুকূলঃ"

মানবসমাজের যে অঙ্গটী অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় দুর্ব্বল তাহার নাম বামা। তাই স্ত্রীলোকের নাম সংস্কৃতে বামা—অবলা। যাহা ক্রিয়াশীল তাই দক্ষিণ শব্দবাচ্য, আর যাহা অকর্ম্মণ্য তাহাই বাম। বামবাহুকে ইংরাজীতে left বলে কেন?

left অর্থে পরিত্যক্ত—কর্ম্ম হইতে পরিত্যক্ত, কোন কর্ম্মের নহে। আর দক্ষিণবাহুকে right বলে কেন? right এর এক অর্থ অধিকার—যাহার কর্ম্মে অধিকার আছে তাহাই right। এককথায় দক্ষিণবাহু সবল পুরুষের এবং বামবাহু অবলানারীর সহিত উপমিত হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আদিম কালে এই বাহুদ্বয়ের কার্য্য বিভিন্ন প্রকার ছিল। হস্তদ্বয় এখন যে নিয়মে কার্য্য করে তাহা আধুনিক। পুরাকালে আদিম অসভ্যেরা যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। তাহারা যুদ্ধ দ্বারা সখ্যতা প্রেমালাপ এবং বিবাহ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিত। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পর, তাহারা সেই সকল মনুষ্যমৃতদেহ ভোজন করিত, তাহাদের আহার বিহারে যুদ্ধ। যুদ্ধকেই সুখ শান্তি ভাবিত। যুদ্ধের সময় তাহারা বিবেকজ্ঞানশূন্য হইয়া সড়কি, বড়শা, তীর, বড় বড় বৃক্ষশাখা, প্রস্তর প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে প্রক্ষেপ করিত। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে ভীষণ দন্ত, নখর এবং মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। তাহারা কখন কাহারও নিকট শরীরতত্ত্ব জানিয়া দক্ষিণ বাম প্রভেদ করিতে শিক্ষা করে নাই, তবুও তাহারা স্বভাবতঃ বামহস্তে বামবক্ষ বর্ম্মাবৃত করিতে চেষ্টা করিয়া দক্ষিণহস্তে অস্ত্রচালনা করিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বামবক্ষ হৃৎপিণ্ডের অধিকারে থাকাতে বামদিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। বোধ হয় যেন পূর্ব্ব হইতেই এই দক্ষিণ বামের পার্থক্যভাব অন্তরের একপ্রান্তে বালুকা-পরিমাণ স্থানে লুকায়িত থাকিয়া মনুষ্যের উন্নতির পথের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অধুনা সভ্যজগতে এই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা উন্নতির পথে অবতরণ করতঃ শরীরতত্ত্ব বাহির করিয়া দক্ষিণহস্তকে সহায় করিয়াছেন। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া দক্ষিণহস্তকে কোন্‌দিকে কি ভাবে চালাইলে সুশৃঙ্খলারূপে কার্য্য চলিতে পারে—এই প্রকারে ইহার গতি পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। মনুষ্যের স্বভাব সোজা পথে চলা, সহজে কখন বক্রপথে যাইতে ইচ্ছা করে না। দক্ষিণ হস্তের স্বাভাবিক গতি বামদিকে, দক্ষিণ দিকে নয়, এবং বামহস্তের গতি দক্ষিণ দিকে, বামদিকে নয়, সেই কারণে দক্ষিণহস্তের সুবিধার জন্য উন্নতিবৃদ্ধির সঙ্গে

তরবারি বামদিকে ঝোলান, সামাজিক নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আবশ্যক হইলে দক্ষিণবাহু বামদিকাভিমুখ হইয়া তরবারি গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহ দক্ষিণহস্ত যুদ্ধেতেই শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করিয়া ক্রমে অন্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে। কারণ প্রথমে যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন কার্য্যই ছিল না। দক্ষিণ হস্তের গতি আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে ইচ্ছা কর ত তুমি একটি পেন্সিল লইয়া মনুষ্যের পার্শ্বের মুখ আঁকিতে চেষ্টা কর। দেখিবে দক্ষিণহস্ত প্রথমেই বামদিকে অগ্রসর হইয়া সহজে রেখাপাত করিতেছে। আমাদের দৃষ্টিও বামদিক হইতে আরম্ভ হয়। আমরা কখন দক্ষিণদিকে মস্তক ফিরাইয়া দেখিতে পারি না। কোন দৃশ্য দেখিতে হইলে বামদিক হইতে দেখিতে দেখিতে ক্রমে দক্ষিণদিকে আসি। ইহা যে আমরা ইচ্ছা করিয়া করি তাহা নয়; অন্তরেন্দ্রিয় যান্ত্রিক অবস্থা বুঝিয়া আমাদের চালাইয়া বেড়ায়। মনুষ্য যে দক্ষিণ হস্তের পক্ষপাতী তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। লেখা সম্বন্ধেও এই এক প্রণালী।

বিখ্যাত লেখক গ্রাণ্ট এলেন বলেন, আদিম মনুষ্যেরা সব্যসাচী ছিল। তাহারা দুই হস্তেই ছবি আঁকিতে এবং লিখিতে পারিত। অনেক দেশে পর্ব্বত গহ্বর হইতে অস্থি প্রস্তর এবং হস্তিদন্তের উপরে নানা প্রকার ভাবের খোদিত মনুষ্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তির মুখ বামদিকের ন্যায় দক্ষিণদিকেও অতি সুন্দররূপে খোদাই করা। এই আবিষ্কৃত মূর্ত্তি আদিম মনুষ্যদিগের যে উভয় হস্তেরই কারুকার্য্য তাহা সূক্ষ্মরূপে তথ্যানুসন্ধান করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইদানীং কালের সব্যসাচী ভিন্ন দক্ষশিল্পকার হইলেও এপ্রকার উভয় হস্তে খোদিত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আশ্চর্য্য পুরাকালে আদিমদের প্রস্তরই একমাত্র সম্বল ছিল। তাহারা যুদ্ধের জন্য এই প্রস্তরের তীর ধনুক এবং অন্যান্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। তদ্ভিন্ন তখন মসীদ্বারা লিখিবার পরিবর্ত্তে তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তরের উপর অক্ষর কথা এবং মীসরীয় হাইরোগ্ল্যাফি খোদাই করিত। এই কারণে হিব্রু পারসী ভাষার বিপরীত ভাগ দক্ষিণ দিক হইতে লিখিতে হয়। বর্ত্তমানে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বরীতি অনুসারে চলিয়া আসিতেছে ছাড়িতে পারে না। ফলতঃ এই সকল পুস্তকের আবরণও উল্টা করিয়া বাঁধান হয়। কিন্তু এখন আমরা যদি মসী দিয়া

দক্ষিণদিক হইতে লিখিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে দেখি একটি অক্ষর লিখিয়া আর একটী লিখিতে যাইলেই অঙ্গুলি ঘর্ষণে ঐ কালী মুছিয়া গিয়া অক্ষর এবং কাগজ দুই অপরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের বামদিক হইতে লেখাই সুবিধাজনক। এখন দেখিতেছি আমরা দক্ষিণ হস্তের সহায়তাতেই সেই সকল স্থূল পাশব কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্রমে সভ্যতার আগমনে উন্নতির সূক্ষ্ম পথে উঠিতেছি।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

বেহালার সুর চড়ান।

ইউরোপীয়েরা বেহালা বাজাইবার সময় যে প্রকারে বেহালার তার চড়াইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। তাহারা চতুর্থ তারকে পঞ্চম সুরে, তৃতীয় তারকে তাহার পঞ্চমে, দ্বিতীয়কে পুনঃ তৃতীয়ের পঞ্চমে এবং প্রথমকে সেইরূপ দ্বিতীয়ের পঞ্চমে চড়াইয়া বেহালার সুর বাঁধে।—প্রথমেই তাহারা কোকিলের পঞ্চমসুরের ন্যায় বেহালারূপ কোকিলটীর সুর পঞ্চম হইতে পঞ্চমে চড়াইবার অভিলাষী হইল; তাহাদের হিসাবে আমরা বেহালার এই চারিটী সুরের তন্ত্রী পাইলাম :

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
গা	ধা	রে	পা

এই চারিটী তারকে ঠিক স্বরগ্রামের গ্রাম অনুসারে সাজাইতে গেলে এই হয় :

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
২ গা	ধা	রে	পা ২

এই চারিটী তারে আমরা সংস্কৃতসঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রুতিবিচার অনুসারে প্রকৃতপক্ষে পঞ্চমের চারিশ্রুতি, ঋষভের তিনশ্রুতি, ধৈবতের তিনশ্রুতি ও গান্ধারের দুই-

শ্রুতি লাভ করিলাম। পঞ্চমের চারিশ্রুতি হইতেছে: ক্ষতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপনী। ঋষভের তিনশ্রুতি হইতেছে: দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা। ধৈবতের তিনশ্রুতি হইতেছে: মন্দন্তি, রোহণী, রম্যা। গান্ধারের দুইশ্রুতি হইতেছে: রৌদ্রী, ক্রোধী। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা বেহালার চারিতারে দ্বাদশ প্রকার শ্রুতি পাইলাম। অর্থাৎ দ্বাদশপ্রকার শ্রবণ্যযোগ্য সূক্ষ্মবিন্দু লাভ করিলাম। বেহালার যন্ত্রাদিতে এই সূক্ষ্ম ধ্বনিবিন্দুসমূহের বড়ই কার্য্য-কারিতা। "স্বল্পমাত্র শ্রবণ হইতে নাদানুরণনাত্মা ধ্বনিকে শ্রুতি বলে।"

স্বল্পমাত্র শ্রবণান্নাদানুরণনাত্মিকা
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্ম্মতাঃ॥
ষড়জাদিপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেবতৎ॥

শ্রুতিসমূহের ফল ষড়জাদি পরিজ্ঞান।

পুনশ্চ 'স্বরাঃ শ্রুতিসমুদ্ভবা' সঙ্গীতশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। স্বরসকল শ্রুতি-সমুদ্ভূত। শ্রুতিই স্বরের সার—সূক্ষ্মবিন্দু বলিতে পার। সত্যের তলে যেমন ঋত অর্থাৎ সত্যের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম সত্য যেমন ঋত, সেইরূপ স্বরের অন্তরস্থ স্বর হইতেছে শ্রুতি। এই শ্রুতির ভাব বেহালাদি যন্ত্রে স্বরের তলে স্বরসরস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বাইশ প্রকার শ্রুতি আছে, কিন্তু অনন্ত শ্রুতি ইহাও কথিত হইয়াছে। বাস্তবিকই এই অনন্ত শ্রুতি লইয়াই সঙ্গীত চলিতেছে। বেহালা যন্ত্রটীর তুল্য সবসুরব্যক্তকারী যন্ত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যন্ত্রে অনন্তশ্রুতিই যেন ব্যক্ত হইয়া থাকে। ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিই যেন বহির্গত হয়।

সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র হিসাবে আমরা বেহালার কতপ্রকার জাতীয় সুরের ভাব প্রাপ্ত হইলাম?—প্রধান তিন প্রকার জাতীয় সুরই পাইয়াছি, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। পঞ্চম সুরটী ব্রাহ্মণজাতি, ঋষভটী ক্ষত্রিয়জাতি, ধৈবতটীও ক্ষত্রিয়জাতি এবং গান্ধারটী বৈশ্যজাতি। সুরের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ভাব ও বৈশ্যভাব এই তিন ভাবই ব্যক্ত হইতে পারে। এই তিন প্রকার ভাবই প্রকৃত মূল; ইহা হইতে সকল জাতীয় সুরের ভাব নাবিয়াছে।

পঞ্চমসুর হইতে পঞ্চমসুরে যে বেহালার তার চড়ান হয় তাহা ভাল। পঞ্চমসুরকে পিতৃবংশোদ্ভবসুর বলে। গান্ধারসুরটী হইতেছে দেবান্বয়সম্ভূত,

এইটী প্রথম তার। আর চতুর্থ অর্থাৎ অন্তের তারটী পঞ্চম, পিতৃবংশোসম্ভূত। মাঝের সুর দুটী ঋষিবংশোদ্ভূত। যাক্‌, আমরা চারিটী তারে দেব ঋষি পিতৃ-ভাবও তাহা হইলে পাইলাম। আদিতে দেব ও অন্তে পিতৃভাব সম্পূর্ণ দেখিলাম। আদ্যন্তে দেবপিতৃ এবং মধ্যে ঋষিভাব বিদ্যমান। আদ্যন্তে ব্রাহ্মণ বৈশ্যভাব এবং মধ্যে ক্ষত্রিয়ভাব।—ঋষভ ও ধৈবত সুর দুটী ক্ষত্রিয়জাতি। যাইহোক আমরা বেহালার চারিটী তারে ভাব পাইলাম: ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যভাব পাইলাম, দেব ঋষি পিতৃভাব পাইলাম।

এখন একটী কথা আছে—সঙ্গীতজ্ঞেরা যে বেহালায় গান্ধারকে প্রথম করিলেন তাহা যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কেন না প্রথমেই তীব্রভাব ভাল নয়; প্রথমে শিশুর ন্যায় স্নিগ্ধভাব আবশ্যকীয় ও স্বাভাবিক। যেমন প্রাতঃ সন্ধ্যায় ঊষার স্নিগ্ধভাব প্রকৃতিতে বিরাজ করে, সেইরূপ স্বাভাবিক স্নিগ্ধভাব প্রথমে বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে গান্ধারটী যে বেহালায় প্রথম তার ক্ষুদ্রতম তার বলিয়া প্রতীচ্য সঙ্গীত বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বাভাবিক।—গান্ধার-সুরের রং সোণার মত উজ্জ্বল পীতবর্ণ। এতে একটী স্নিগ্ধতা আছে; লাল রঙে তীব্রতা হয়, পীতবর্ণে স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা থাকে। সেই হেতু গান্ধারকে প্রথম করাই ঠিক।

"গান্ধার হচ্চে 'স্বর্ণবর্ণ' :—

গান্ধারস্য দেবাম্বয়ে সম্ভূতিঃ
বৈশ্যজাতি স্বর্ণবদুজ্জ্বলপীতোবর্ণঃ
ঋষিঃ শশাঙ্কঃ ... ...
করুণরসে উপযোগিত্বম্।"

প্রথম তারকে তাই শিশুর ন্যায় স্নিগ্ধ মধুর গান্ধার সুরে করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়: গান্ধারসুরের মাধুর্য্যের সম্বন্ধে মহাভারতে একস্থলে আছে:—"যেমন লতা প্রকাণ্ড শালবৃক্ষকে, মৃগরাজবধূ প্রসুপ্ত মৃগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণা-বিনির্গত গান্ধার স্বরের ন্যায় মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ গাত্রোত্থান কর।"

এই সকল আলোচনা করিয়া বুঝা যায়, বেহালার প্রথম তারটীকে গান্ধার-স্বরে রাখা এবং অন্তে পিতৃবংশোদ্ভূত পঞ্চমস্বরকে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ তার করা কিছু অযোগ্য হয় নাই; বেহালার তারে য়ুরোপীয়েরা আদিতে দেব, মধ্যে ঋষি ও শেষে পিতৃস্বরকে স্থাপন করিয়া আর্য্য সঙ্গীত শাস্ত্রীয় ভাবেরই যেন যথার্থ সৎকার করিয়াছেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদরাগ।

ভক্তি।

ছায়ানট—একতালা।

ক্ষুদ্র মোর শক্তি;
সংসারেতে জানি সার একমাত্র ভক্তি;
সূর্য্য যবে উঠে,
ক্ষুদ্র শতদলটুকু সেও ওঠে ফুটে;
পূর্ণচন্দ্র দেখে
সাগর উথলি উঠে জোছনায় মেখে;
সেই মত আমি,
মহান শকতি পাই ভক্তিভরে স্বামি!

কেন দাওনাক দরশন?

আসাবরী—ঝাঁপতাল।

কেন মোহঘোরে রাখ
দাও নাক দরশন—
কেন প্রভাতের আলো
নাহি কর বিকীরণ?
কেন নিশা-অন্ধকারে—
রাখ মোরে অচেতন?
কেন দাও শূন্য প্রাণে
মোহমেঘ আবরণ?
জগৎ জাগিয়া আছে
তব কাজে অনুক্ষণ;
কেন গো জীবনে মোর
নাহি দাও জাগরণ?

শুভ ফল।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

কেমনে দাঁড়াব গিয়া সমুখে পিতার,
একটীও কথা যবে শুনিনি তোমার;
যে কাজে এখানে তুমি পাঠাইলে মোরে,
তাহা করি নাই শেষ আলসের ঘোরে;

যে ধন আমার হাতে দিয়ে তুমি পূরে ;
হারায়ে ফেলেছি তাহা কোন্ মায়াপুরে ;
নিরাশ্রয় হয়ে তাই ভ্রমি পথে পথে,
কত লোক চলে যায় পূর্ণ মনোরথে ;
শেষ দিনে যবে হবে কর্ম্মের বিচার,
কি বলি' চাহিব তবে মুক্তির দুয়ার ?
করেছি অশেষ দোষ শাস্তি যা' দিবার
দুঃখ ক্লেশ আমরণ দিও অনিবার ;
কিন্তু শেষে দিও যেন এই শুভফল
শান্তিরস-পরিপূর্ণ চরণ অমল।

প্রাণারাম।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

যিনি এক প্রাণারাম,
ভজ তাঁরে মনে অবিরাম ;
হৃদয়ে রাখিয়ো তাঁহারি চরণে পূর্ণ হবে মনস্কাম ; (তব)
বিষয়ের ধূলি, যাও ত্বরা ভুলি, যাবে যদি দিব্যধাম। (সেই)
নিখিল কারণ পরম শরণ, তাঁরে করহ প্রণাম (সদা)
গাও তাঁর গান, অসীম কল্যাণ হবে শুভ পরিণাম। (হে)

অপূর্ব্ব কাণ্ড।

শঙ্করা—আড়াঠেকা।

অণুর ভিতরে সূক্ষ্ম অণু,
লক্ষ্য কর তায় চিত্ত-ধনু ;
জ্যোতির অন্তরে সূক্ষ্মজ্যোতি,
বিন্দুমাঝে অনন্ত মুরতি ;
দেখ কিবা সে অপূর্ব্ব কাণ্ড—
বিন্দু মাঝে অসীম ব্রহ্মাণ্ড।

পাপাত্মারে করিওনা ঘৃণা।

পরজ—ঝাঁপতাল।

পাপাত্মারে করিওনা ঘৃণা ;
পুণ্যনাম ঝঙ্কারিয়া তারে শুনাওরে তাঁর জয়বীণা,
পাপমতি দুরবল অতি রিপুহস্তে চিরপরাধীনা।
পাপের শৃঙ্খল ছিন্ন
কে করিবে তিনি ভিন্ন,
পাপাসুরে বিনাশিতে সাধ্য কার তাঁর বজ্রবল বিনা ?

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুত্রস্নেহ।

(গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কবিত্বপূর্ণ মধুর যৌবন কালে যখন জগতের সাড়ে ষোল আনা অতুল সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলাম, তখন সুদূর প্রবাসে—কলিকাতায় বসিয়া হঠাৎ যখন অগ্রজ মহাশয়ের টেলিগ্রাম পাইলাম—, "Come sharp *Bowma* is in deathbed."—তখন কি জানি কেন সহসা আমার চোখে জগতের সকল সৌন্দর্য্যরাশি এককালে নিবিয়া গেল। টেলিগ্রাম পাইয়া কতক্ষণ আত্মহারার ন্যায় ছিলাম—জানি না; তবে যখন আমার প্রথম হৃদয়-বেগ কাটীয়া গেল, তখন তাড়াতাড়ি আহার করিয়া টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া আফিসের বড় সাহেবের খাসকামরায় যাইয়া সাহেবের টেবিলের উপর টেলিগ্রামখানি রাখিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটি দীর্ঘ সেলাম করিয়া এক পক্ষের বিদায় প্রার্থনা করিলাম। ইংরেজজাতির চরিত্রে দোষ ও গুণ—এই উভয়ের মধ্যে গুণভাগের অপেক্ষা দোষভাগের আধিক্য সর্ব্ববিষয়ে অধিক হইলেও এক্ষেত্রে গুণভাগেরই অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। এদিকে আমায় দেখিয়া সাহেব একবার মুখের চুরুটের ছাইগুলি নখের দ্বারায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নাকের উপর হইতে চসমাখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া একবার রুমাল দিয়া পুঁছিয়া চসমাখানি নাকের উপর পুনঃ স্থাপিত করিয়া টেবিলের উপর হইতে টেলিগ্রামখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। তারপর কি জানি কেন, কত-ক্ষণ আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন; শেষে স্ত্রীর কাতর সংবাদ শুনিয়া বিনা আপত্তিতে এক সপ্তাহের বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন প্রয়োজন হইলে, আরও দুই এক সপ্তাহের বিদায় পরে দিবেন। আমি অধম চাকুরীজীবী বাঙ্গালী আমি আমার বর্ত্তমান দুঃসময়ে সাহেবের এই অপার অনুগ্রহ দেখিয়া এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দুই হাতে সাহেবকে আভূমি প্রণত

সেলাম করিয়া সেইদিনকার দারজিলিং মেলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে গৃহে আসিলাম। গৃহে আসিয়া আমার প্রাণাধিকা পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনীর কাতর অবস্থা দেখিয়া পলে পলে আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এই ঘটনার ঠিক চারি মাস পূর্ব্বে আমার ভাগ্যবৃক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলস্বরূপ একটি সুবর্ণকুসুম আমাকে উপহার দেন। কিন্তু সেই পুত্রসন্তান প্রসবের পর হইতেই কি জানি কেন হঠাৎ হেমনলিনীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতিকাশ্রিতা রোগগ্রস্তা হন। এই দীর্ঘ চারি মাস কাল সুচিকিৎসকের সুচিকিৎসা ও আমার অগ্রজ পত্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর অজস্র শুশ্রূষায় হেমনলিনীর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার তো দূরের কথা; বরং দিনের পর দিন যতই যাইতেছিল, দিন দিন ততই মরণের পথে, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। শেষে তাঁহার জীবনের আশা দুরাশা মনে করিয়া, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে আমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার মানসে অগ্রজ মহাশয় আমাকে দ্রুত টেলিগ্রাম করেন।

আমি যে দিন গৃহে আসিলাম, ঠিক তাহার দুই দিন পরে, তৃতীয় দিবস রাত্রিতে জীবনে এই শেষ একবার করুণাপূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আপনার হৃদয়শোণিত তুল্য চারি মাসের শিশু পুত্রটিকে বউঠাকুরাণীর হাতে জন্মশোধ অর্পণ করিয়া দিয়া, সেই দিন নিশাশেষে আমার পায়ে মাথা রাখিয়া, কি জানি কোন অজানিত পুণ্যময় দেশে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখপূর্ণ শান্তিপূর্ণ জীবন-কাব্যের প্রথম সর্গের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন কাটিয়া গেল। তারপর যথাসময়ে অশৌচান্তে হেমনলিনীর আদ্যকৃত্য সমাপন করিয়া আমি ভগ্নহৃদয়ে আমার কার্য্যস্থান কলিকাতা আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিলাম।

* * * *

সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় এবং সেই সঙ্গে কাব্যালোচনায় হেমনলিনীর মৃত্যুর পর কার্য্যস্থানে আসিয়া, দেখিতে দেখিতে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। পাঁচ মাস পর হঠাৎ একদিন অগ্রজ মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। অগ্রজ মহাশয় পত্রে লিখিয়াছেন :—

স্নেহের প্রফুল্ল !

ইতিপূর্ব্বে তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছি,—সাংসারিক কথাবার্ত্তা তাহাতেই আছে। সম্প্রতি তোমার কয়েকটা প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে দীর্ঘকাল গত হইল, আর বিপত্নীক অবস্থায় বেশী দিন থাকা ভাল দেখায় না, এবং তোমার বিবাহে আমাকে উদাসীন দেখিয়া গ্রামের সকলেই আমাকে ধিক্কার দিতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত সৎকুলোদ্ভবা কন্যার অভাবে আমি কোনটাতেই মতামত না দিয়া নীরবে ছিলাম। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে যে কটি প্রয়োজন উপস্থিত আছে, তাহার মধ্যে শিবনগর নিবাসী দেবানন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীর সহিত তোমার শুভ পরিণয় স্থির করিতে চাহি। শাস্ত্রী মহাশয়ের দুহিতা রূপে গুণে, স্বভাব চরিত্রে—সর্ব্ববিষয়ে প্রসংশনীয়া ও সুলক্ষণ বিশিষ্টা। তারপর শাস্ত্রী মহাশয় বুনেদি ঘরের লোক—আমাদের সমান ঘর। আশা করি তুমিও এ বিবাহে প্রসন্নচিত্তে মত প্রকাশ করিবে। তোমার সম্মতিসূচক পত্র পাইলে, আমি প্রয়োজন স্থির করিব এবং আগামী মাসে তোমার বিবাহ ও শ্রীমান নবকুমারের শুভান্নপ্রাশন দিব। শ্রীমান সহ আমরা ভাল আছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক

তোমারই শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র।

দাদার পত্র পাঠ করিয়া, এখন লিখিলে হয়ত আপনারা—চারুহাসিনী বঙ্গের সুন্দরী পাঠিকারা, আপন আপন কুন্দবিনিন্দিত দন্তে তাম্বুল-রাগরক্ত

অধর যুগল দংশন করিয়া মধুর হাসি হাসিবেন—হাসুন, ক্ষতি নাই। তবে আমার জীবনে বিপত্নীক অবস্থায় সত্য যাহা ঘটিয়াছিল, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা মানসে এখানে তাহাই বিবৃত করিতেছি। হাঁ, অগ্রজ মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া আমার তখন কান্না আসিয়াছিল—কান্না আসিয়াছিল, অমন চারু প্রেমপ্রতিমা হেমনলিনী দেবীকে এত শীঘ্রই যে বিস্মৃতির অতলসলিলে ডুবাইতে হইবে তাহা একবার স্বপ্নেও মনে করি নাই। যিনি আজ এই সুদীর্ঘ দশ বৎসর অকাতরে আপনার হৃদয় ও মন দিয়া কায়মনোবাক্যে আমার সাধনা করিয়া আসিতেছিলেন; শেষ, যিনি আপনার আশৈশবের সাধনার ফলস্বরূপ কুসুম-সুকুমার পুত্ররত্ন আমাকে দান করিয়া, অকালে—বলিতে হৃদয় শতধা-বিদীর্ণ হয়—অকালে ইহসংসার হইতে জন্মশোধ চলিয়া গিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী আমার হৃদয়েশ্বরী হেমনলিনীর দেবীমূর্ত্তি জন্মশোধ হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া আবার কোন প্রাণে অপরকে আমার এই হৃদয় রাজ্যের শূন্য স্বর্ণসিংহাসনে বসাইব আর কেই বা সেই স্বর্ণসিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাহা হউক, প্রথম শোকোচ্ছ্বাস কাটিলে পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দাদাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। পত্রে লিখিলাম :—

কলিকাতা

——ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

প্রণাম জানিবেন :—

দাদা, শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইলাম। কিন্তু পত্র পাইয়া অদৃষ্টদোষে এবার সুখী হইতে পারিলাম না। আপনি পুনরায় আমার বিবাহের জন্য ক'নে খুঁজিতেছেন এবং বিবাহ করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন, কিন্তু হেমনলিনীর মৃত্যুর পর শ্রীমানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি পুনরায় বিবাহ না করাই স্থির করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে পারিবারিক গোলোযোগের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে পুনরায় বিবাহ করিয়া, শ্রীমানের—প্রাণাধিকা হেমনলিনীর শেষ স্মৃতিচিহ্নখানির ভাগী পরদা করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই—প্রবৃত্তিও নাই। আশা করি আপনি বা স্নেহময়ী বউ-ঠাকুরাণী—আপনারা উভয়ে এবিষয়ে আমাকে আর কোন অনুরোধ করিবেন

না। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ পুত্রের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং আমার যখন পুত্রসন্তান আছে তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আবার পুনরায় কেন বিবাহ করিব? আপনিই বা কেন এমন অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেন ও অনুরোধ করেন? এখন আপনারা উভয় আশীর্ব্বাদ করুন, যে শ্রীমান দীর্ঘজীবী হইয়া হেমনলিনীর তথা আমাদের নাম রক্ষা করুক। বিবাহে আমাকে বীতস্পৃহ দেখিয়া আপনারা মনে কোন দুঃখ করিবেন না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি বড় সুখে—বড় শান্তিতে আছি।—বৃথায় কেন আমার জীবনের শান্তির ব্যাঘাত করিবেন? আপনি আমার শত সহস্র প্রণাম জানিবেন এবং বউঠাকুরাণীকে জানাইবেন। পত্রোত্তরে শ্রীমান সহ আপনাদের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন। ইতি

আপনার স্নেহের
শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র।

যথাসময়ে পত্র রওনা হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পত্র লিখিবার পর দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহ পর, এক সঙ্গে দুইখানি পত্র পাইলাম। একখানি আমার অগ্রজ মহাশয়ের, দ্বিতীয়খানি তাঁহারই পত্নী—আমার বউঠাকুরাণী নিস্তারিণী দেবীর। আমি প্রথমে দাদার পত্র খুলিলাম। দাদা এবার লিখিয়াছেন:—

স্নেহের প্রফুল্ল!

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমাকে যে যে বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে আমার কোন স্থলেই তোমার সহিত মতদ্বৈধ নাই। তবে সংসার ক্ষেত্রে এক দিক দেখিয়া কাজ করিতে নাই—করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি বিবাহে বীতস্পৃহ, আমি জানিতেছি যে বউমার শোক তোমার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আর শুধু তুমি কেন? এ সংসারে কে এমন পাষাণ আছে যে, যিনি অমন সাক্ষাৎ সরলতা ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হেমনলিনীর চিরবিচ্ছেদে

মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ না করিবেন? পূর্ব্বপত্রে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছি বলিয়া, তুমি এমন মনে করিও না যে, আমি হেমনলিনীর বিয়োগজনিত অসহ্য হৃদয় যাতনা এত শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়াছি। হেমনলিনীর হঠাৎ মৃত্যুতে আমার হৃদয়ের অর্দ্ধেক শক্তি হানি হইয়াছে। আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এমন অসময়ে আমাকে আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মীকে এমনই ভাবে পাষাণ প্রাণে বিদায় দিতে হইবে? যেদিন হেমনলিনীকে ভ্রাতৃবধূরূপে গৃহে আনিয়াছিলাম, যেদিন মা আমার ন্যায় চিরদরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে আসিয়া আপনা আপনি ফুটীয়াছিলেন—যেদিন আপনার অনন্ত চরিত্র গৌরবে আমার চিরদরিদ্র পর্ণকুটির গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, সেদিন মনে করিয়াছিলাম যে, না জানি জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাই দেশের অতি বড় দুর্দ্দিনে অমন মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ কমলাকে গৃহে আনিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এখন—এখন সে কমলার বিয়োগে আমার এই পর্ণ-কুটির আঁধার—গাঢ়তর অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি সংসারক্ষেত্রে আমার মত হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আক্ষেপ করিয়া কি করিব—বল। আজীবন কাতর অশ্রুপাতে কাটাইলেও যখন যিনি গিয়াছেন তিনি আর ফিরিবেন না—তাঁহাকে ফিরাইবার আর উপায় নাই; তখন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভুলিয়া অতীতের জন্য আক্ষেপ করিয়া কি করিব? তাই এই কয়মাস ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, আবার তোমার বিবাহ দেওয়াই স্থির করিয়াছি। তুমি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়াছ—তোমার সে সব যুক্তি ঠিক হইলেও তোমার পক্ষে তাহা কখনই খাটে না। বর্ত্তমান সময়ে তোমার যে বয়স তাহাতে বিপত্নীক অবস্থায় থাকা শোভা পায় না। তারপর আর এক কথা—পুত্র বর্ত্তমান। পুত্র বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এক পুত্র বর্ত্তমান এবং সেও শিশু, সে ক্ষেত্রে তোমার মত বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করাই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য এবং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও কতকটা এমনই উপদেশ আছে। আর যে আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র পুত্র বর্ত্তমানে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রই এক পুত্রকে পুত্র মধ্যে গণনা করেন নাই। সুতরাং এক পুত্র স্থলে

এমন কঠোর নিয়ম করিলে চলিবে কেন? দেখ আমার ও নিস্তারিণীর যে বয়স, তাহাতে আমাদের সন্তানাদি হইবার আর কোন আশা নাই; সুতরাং পিতৃপিতামহাদির ভবিষ্যৎ জলপিণ্ডের আশা একমাত্র তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। যদি এখন তুমি সত্য সত্যই বিবাহ না কর, আর ঈশ্বর না করুন—কালে যদি তোমার এই অনাথ শিশু পুত্রটির কোন অমঙ্গল হয় তাহা হইলে চিরদিনের জন্য পিতৃপিতামহের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। এমন স্থলে ভবিষ্যতের মোহে বর্ত্তমানের সুযোগ পরিত্যাগ করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ একবার বিচার করিয়া দেখিও। তারপর আমি—সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় কোন স্নেহবন্ধন নাই, যাহার মুখপানে চাহিয়া সংসারে থাকি। এমন অবস্থায় এই বয়সে তুমি যদি উদাসীন হও তবে কাহার মুখপানে চাহিয়া সংসারে রহিব সেটাও একবার ভাবিয়া দেখা তোমার কর্ত্তব্য। পুত্র বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিলে বিমাতা হইতে শিশুর ভবিষ্যৎ যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছ—এই বৃথা আশঙ্কার কোন কারণই তো আমি দেখিতে পাইতেছি না। কালে যদি তোমার নব পরিণীতা ভার্য্যার সহিত শ্রীমানের বনিবনাও না হয়—উত্তম। কেন না আমি ও নিস্তারিণী তোমার পুত্রের দিকে রহিলাম ইহাই কি শ্রীমানের পক্ষে যথেষ্ট নহে? এবিষয়ে অধিক আর কি লিখিব, চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা ভাল হয় করিও। তবে এটা মনে রাখিও যে, যদি নিতান্তই তুমি বিবাহে অসম্মত হও তবে অগত্যা আমাকেও বাধ্য হইয়া দেশের মায়া কাটাইয়া শীঘ্রই সস্ত্রীক তীর্থবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—পুণ্য-গৃহে তোমাকে উদাসীন দেখিয়া আমি কখনই বাস করিতে পারিব না। ইতি

তোমার—শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র।

অগ্রজ মহাশয়ের পত্র পাঠ সমাপন করিয়া বউঠাকুরাণীর পত্রখানি পাঠ করিলাম। দাদার পত্রখানি যেমন বিবিধ উপদেশ ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ, বউ-ঠাকুরাণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পত্রখানি তেমনি আগাগোড়া তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে বউঠাকুরাণীর এই তীব্র কষাঘাত বড় কাজে লাগিবে তাই পত্রখানির সম্পূর্ণ নকল এখানে দিলাম। বউঠাকুরাণী পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

দেবপুর।

ঠাকুরপো!

আপনার অগ্রজের নামিক আপনার অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়া আপনার মনে আপনি একগাল হাসিয়া লইলাম। তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমার এই গালভরা হাসি কাহাকেও দেখাইতে পারিলাম না—কেহই দেখিল না। যাহা হউক, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পুনরায় বিবাহ করিবেন না; জীবনে অবশিষ্ট দিন কয়টা আমাদের দেশের হিন্দু বিধবার ন্যায় কঠোর বৈধব্যে কাটাইবেন—বটে। কথাটা ঠিক কবির মতই হইয়াছে। তবে এই প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে একবার মনে করিবেন—কবি হইলেও আপনি পুরুষ। পুরুষের প্রতিজ্ঞা আর পদ্মপত্রের জল—উভয়ই সমান—বড় চঞ্চল। দেখিবেন কালে লোক হাসাইবেন না—আপনাদের কবি ভ্রাতা ভগিনীদের ন্যায় দেশের মুখে চুণকালী দিবেন না। আর এই জন্যই আমার অনুরোধ, এখন পাগলামী ছাড়িয়া দিয়া বিবাহে সম্মত হন—বিবাহ হইয়া যাউক। দু'দিন আগপাছ আপনি বিবাহ করিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য, তখন বর্ত্তমানের সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। আপনি শ্রীমানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইতেছেন—শ্রীমতী ইন্দুর সহিত বিবাহ হইলে সে ভয় আপনাকে কখনই করিতে হইবে না। আর যদি খেয়ালের বশে এখন বিবাহ না করেন তাহা হইলে কালে শ্রীমানের সুখের পথে, পিতা হইয়া আপনিই কাঁটা দিবেন। কেন না, আমি পরিষ্কার জানিতেছি, দু'দিন পরে আপনার বর্ত্তমান খেয়াল কাটীয়া গেলে আপনাকে বিবাহ করিতেই হইবে। আপনি যে বড় বড়াই করিয়াছেন অমন বড়াই অনেকেই করিয়া থাকে, অমন যে শশ্মানঘাটের জ্যান্ত মরা কাশিনাথ শর্ম্মা—কাশিনাথ শর্ম্মা পর্য্যন্ত একদিন অমন বড়াই করিয়াছিল। আপনিইও সেই কাশিনাথের শ্রেণীরই একটা অদ্ভুতজীব, সুতরাং দুইদিনও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না, তেমন বৃথা প্রতিজ্ঞা করিয়া লাভ কি—বুঝি না। যাহা হউক, আর লোক হাসানে কাজ নাই, এখন ফেরত ডাকে বিবাহে সম্মতি সূচক পত্র লিখিবেন। আগামী মাসে শ্রীমানের অন্নারম্ভ ও আপনার বিবাহ এক সঙ্গেই হইয়া যাউক। ইতি

আপনার স্নেহের— শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কর-লগ্ন-কপোলে ভাবিলাম। বউঠাকুরাণীর উপর বড় রাগ হইল। আমাদের দেশের কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিতা অশিক্ষিতা বাঙ্গালীর মেয়েদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে একটু দুঃখ হইল—অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইল। এমনই ভাবে সেদিন কাটিয়া গেল। সারারাত্রি একাকী ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম—বিবাহ করিব না। এমনই ভাবে রাত্রি অতীত হইয়া গেল। পর দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই পত্র লিখিতে বসিলাম। প্রথমে দাদাকে পত্র লিখিলাম। দাদা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমি পুনরায় বিবাহ না করিলে তিনি সস্ত্রীক তীর্থবাসী হইবেন। কিন্তু আমি বেশ জানিতাম যে, আমার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দেশত্যাগী হইতে হইলে যে মানসিক শক্তির আবশ্যক, সে শক্তি তাঁহার নাই—জীবনে কোন দিন সে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন কি না—বিধাতাই জানেন। সুতরাং আমার ভয়ের প্রধান যে কারণ সেটা অতি সহজেই দূর হইয়া গেল। দাদার ভয় কাটিল; কিন্তু বউঠাকুরাণীর বাক্যবাণের ভয়টা রহিয়া গেল। সে কথা যথাসময়ে বলিব।

পত্র লিখিতে বসিয়া, আমি দাদাকে লিখিলাম :—

প্রণাম জানিবেন :—

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি আমার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে যে যুক্তির জাল বিস্তার করিয়াছেন সে জাল কতকটা শক্ত হইলেও আমি আর তাহাতে পড়িতেছি না—পুনরায় বিবাহ করিতেছি না। আপনার শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা আপনিও আর এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিবেন না। পিতৃপিতামহের অদৃষ্টে জলপিণ্ড প্রাপ্ত লেখা থাকিলে একমাত্র শ্রীমান হইতেই হইবে; আর লেখা না থাকিলে দশটা বিবাহ করিলেও হইবে না। সুতরাং বৃথায় কেন আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করিবেন এবং নষ্ট করাই কি আপনার ন্যায় স্নেহশীল ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজের উচিত—একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি ভাল আছি—বেশ শান্তি উপভোগ করিতেছি। আশা করি শ্রীমানকে বুকে করিয়া আপনারাও শান্তি লাভ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র।

দাদার পত্র সমাপনান্তে বউঠাকুরাণীকে লিখিলাম :—

স্নেহময়ী বউঠাকুরাণি !

আমার প্রণাম জানিবেন। কাল আপনার পত্র পাইয়াছি। স্ত্রীজাতি যে এতদূর নিরেট পাষাণী হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে কখনই ভাবি নাই ; নহিলে আপনার বড় স্নেহের সেই হেমনলিনীর মৃত্যুর পর ছয় মাস যাইতে না যাইতে আবার আমাকে বিবাহ করিবার জন্য, আমার প্রতি তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিবেন কেন ? দাদা পুরুষ মানুষ—কতকটা সে কালের লোক তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে পারেন, কিন্তু আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া এমন ভাবে পত্র লিখিলেন—বুঝিতে পারিলাম না। তারপর আপনার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার জীবনের একটা বিষম ভ্রম দূর হইল। আপনি এতদিন 'হেমনলিনী' 'হেমনলিনী' বলিয়া যে পাগল হইতেন—দু'দিন চোখের আড়ালে রাখিতে হইলে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতেন, এখন আপনার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, আপনার সে ভালবাসা খাঁটি নহে—কেমিক্যাল। যাক্ সে সব বাজে কথা লিখিয়া আর কি করিব। তবে আপনি যে আপনাদের বড় আদরের কাশিনাথের সহিত আমার তুলনা করিয়া আমার সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যতদিন কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিতে না পারিতেছি ততদিন আপনার শত প্রকার ব্যঙ্গ ও বিষম বাক্যযন্ত্রণা অম্লান অন্তঃকরণে আমাকে সহ্য করিতেই হইবে—করিবও। তবে সতত মনে রাখিবেন, যখন এই কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইব, তখন সুদসমেত আপনার এই তীব্র শ্লেষ ও মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ একে একে ওয়াশীল করিয়া লইব। আর সত্য কথা বলিতে কি সেই ওয়াশীলাতের জন্যই আপনার আজিকার এই পত্রখানি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিলাম। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র।

পত্র দুইখানি সমাপ্ত করিয়া পুনরায় একবার আগাগোড়া পাঠ করিয়া ডাকে দিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মগোলা।

"The people of England can hardly realise the loss by death in the last Indian Famine. Upwards of 5 millions of human beings more in number than the population of Ireland, perished in that miserable time. If the people of this vast metropolis, with the million in its neighbourhood, were all melted away in a lingering death, even this would not exceed in numbers the loss of India"—Professor Caird and Mr. W. E. Tallivan in the Famine Commission Report 1880.

দুর্ভিক্ষ।

অধুনা ভারতবর্ষে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইতেছে। দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনৃত্যে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ প্রাণী কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে। গত ৪৭ বৎসরে, ২৮,৮২৫০০০ সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ এবং অযোধ্যায় ৮২৫০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে। * গত শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৯৯-১৯০০) যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা কাশ্মীর হইতে মহীশূর এবং উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং ইহাতে প্রায় ২৫০০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। †

---

* The most terrible Famine up to date. over 5 millious in Madras and 125,0000 in Northern India (Mr. R. C. Dutt, C. I. E.)

† Mortality stated by Famine Commissioners at 1250000 but Judging from analogy it is 3 or 4 times that Figure. I carry forward only double the official estimate (Mr. Digby). "The last Famine of this century is also the most wide-spread and the severes famine that has ever visited India" Mr. R. C. Dutt C. I E.

বর্ত্তমান বর্ষে ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ভয়াবহ সংবা৷ প্রায়ই শোনা যাইতেছে। অনশনক্লিষ্ট পরিবারবর্গের কষ্টলাঘবে অসমর্থ ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে এ সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাই- তেছে। শুধু বঙ্গদেশেই নয়—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখের বিলাতের Investor's Review সংবাদ দিতেছেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারী ২৭৪০০০ বর্গমাইলে বরুণদেব বিন্দুমাত্র অনুগ্রহও করেন নাই। ৩রা মার্চ্চ মহামান্য গবর্ণর জেনারেল মহোদয় যে টেলিগ্রাম করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে ৩৭৯০০০ সংখ্যক লোক প্রতি- কার কার্য্যে (Relief works) নিযুক্ত। এবং ১২ই মার্চ্চের টেলিগ্রামে জানা যায় যে যুক্তপ্রদেশ, অযোধ্যা, রাজপুতানা এবং হায়দ্রাবাদে অনাবৃষ্টিতে কোন প্রকার ফসল হইবার আশা নাই। ইতিমধ্যেই যুক্তপ্রদেশে ১২,২০০০, রাজ- পুতনায় ১০৫,০০০, মধ্যপ্রদেশে ৭৫,০০০ এবং বোম্বাই প্রদেশে ৩৩,০০০ লোক Relief works এ নিযুক্ত আছে। এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান বর্ষেও দুর্ভিক্ষের কোপের যে আধিক্য হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়।

কৃষকের দরিদ্রতা।

এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের একজাই দুর্ভিক্ষের কারণ কি? অধিকাংশের মতেই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ভারতবাসিগণের দরি- দ্রতা। * গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারানুসারেই সাধারণ গৃহস্থের আয় বার্ষিক ৩০৲ মাত্র। মিঃ ডিগবী তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষীয় সাধারণ গৃহস্থের

---

* The real cause of Indian famines is the extreme poverty of the people—Revd. J. T. Sunderland The causes of Famine. "এই দারিদ্র্য এরূপ ভয়ঙ্কর যে যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সে বৎসরে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাহা উপার্জ্জন করে, তদ্দারা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না—অর্থ সঞ্চয় করা ত দূরের কথা। সুতরাং যে বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে বৎসর তাহারা আর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।" (স্বদেশ)

আয় ১৮৮৬ মাত্র। * গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণানুসারেও বার্ষিক ৩০৲ টাকা অর্থাৎ দৈনিক কিঞ্চিদধিক /০ আনা মাত্র আয় হইলে দেশের লোকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। যত্র আয় তত্র ব্যয় অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট হইতে পরিবারবর্গের কষ্টকর ভরণপোষণ ব্যতীত আর কিছুই আশা করিতে পারি না।

কৃষকদের এই প্রকার অবস্থার দরুণ শুধু যে কেবল তাহাদেরই ক্ষতি হইতেছে তাহা নয়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধানদেশ। কৃষকদের এবম্প্রকার দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণ সকলেরই বিষম ক্ষতি হইতেছে।—যাহাতে কৃষকদের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি পতিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

উপায়।

সকল অবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া কি কি প্রকারে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে ইহাই এইক্ষণ দ্রষ্টব্য। তিনটী উপায় অবলম্বন করিলে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবে। দেশের ও দশেরও সঙ্গে সঙ্গে উপকার হইবে। †

প্রথম—স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন। (Experimental Agricultural Farms.)

---

* According to calculations made in 1901 by the Govt. of India the average income per head of population in India was found to be £ 2 or Rs. 30 per year. But the late Mr. Digby puts the figure at Rs. 18-12-6 per year.

† If her agriculture possibilities were properly developed she could support easily a greatly increased poputation. (Revd Sunderland).

দ্বিতীয়তঃ—যৌথমহাজনী সভা সংস্থাপন করিয়া যাহাতে কৃষকগণ অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া মহাজনের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। (Co-operative credit Societies, Act 1 of 1904.) *

তৃতীয়তঃ—স্থানে স্থানে ধান্যের গোলা সংস্থাপন করিয়া যাহাতে প্রয়োজন মত অভাবের সময় ধান্যের জন্য অথবা ফসল উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালীন পরিবার বর্গের ভরণপোষণের জন্য অল্পসুদে ধান্য পায়। যে বৎসর ফসল সুন্দররূপে জন্মে সেই বৎসর কৃষকগণ নিজেই এই প্রকার গোলা স্থাপন করিতে পারে। †

অদ্য আমরা এই তৃতীয়টীর বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

(ইউরোপের Positos এবং Monte Frumentarii.)

কৃষকদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য এবং ফসল উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালেন (অর্থাৎ ধান্য বপন এবং ছেদন করিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে) যাহাতে কৃষকদের অভাবে পড়িয়া টাকার দাদন লইয়া পূর্ব্বেই ধান্য বিক্রয় না করিতে হয় তজ্জন্য ইউরোপের কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইতালির Monte Frumentarii এবং স্পেনের Positosই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষকদের অব্যবহিত অভাব দূর করিবার জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালি দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক জিলার কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিতেন। এই সমস্ত গোলা হইতে বিশেষ আবশ্যকের সময় সাহায্য করা হইত; কেবল বীজবপনের সময় সকলকেই সাহায্য করা যাইত।

---

* "প্রতিভা" কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩১২।

† By inducing village communities to keep a common stock of grain in a good year and by profitably investing the same in comparatively bad years, a reserve might be built up in each village which would enable the villagers to keep them going during a period of scarcity and also to avoid a calamity through any sudden failure in crops. "Dharmagolla or a system of co-operative Grain Bank by Rai Parvati Sankar Choudhury."

স্পেনের Positos অধুনা এক প্রকার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত হয় কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজক মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গোলাতে গ্রামের শস্য যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা মজুদ করা হইত এবং দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে বিতরণ করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই ধরণে স্পেনের প্রত্যেক জিলাতে একটী একটী করিয়া গোলা এবং তাহাদের পরিচালনের জন্য একটী একটী করিয়া সভা আছে। শতকরা ৪৷৷০ টাকা করিয়া সুদ শস্যের উপর আদায় হয় এবং শতকরা ৷৷০ আনা করিয়া কর্জ্জ টাকার উপর আদায় করা হয়। জিলার কমিটীর সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করেন এবং লাভের অংশ মূলধনে যোগ করা হয়।

আমাদের দেশের এই প্রকার গোলার আবশ্যকতা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশের কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র। এমত অবস্থায় তাহাদের নিজ নিজ শক্তিতে যে তাহারা দেশের কিছু করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। তবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিতে যাহা না করিতে পারা যায় সমবেত এবং সম্মিলিত শক্তিতে তাহা করা সহজসাধ্য। মনে করুন যে বৎসর ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই বৎসর কোন এক গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া স্ব স্ব সাধ্যমত কিছু কিছু ধান্য দান করিয়া একটা গোলাজাত করিল। বিশেষতঃ যে বৎসর ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সে বৎসর গ্রাহকতা (Demand) অপেক্ষা সরবরাহতা (Supply) বেশী হওয়াতে ধান্যের দর কমিয়া যায়। এবং সুবিধা বুঝিয়া ইংরেজ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ কম দরে ধান্য ক্রয় করে। ফলে, সরবরাহতা অপেক্ষা গ্রাহকতা বেশী হয়—এবং ধান্যের দর পুনরায় চড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহাতে যে সমস্ত কৃষক ধান্য পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়াছিল তাহাদের কোনই লাভ হয় না। অধিকন্তু ব্যবসায়ীগণ কম মূল্যে ক্রয় করিয়া ধান্য রপ্তানি করে। ফলে কৃষকগণই কষ্ট পায়। কিন্তু মনে করুন যে কৃষকগণ এই ধান্যের আধিক্য অংশ (Surplus) সস্তাদরে বিক্রয় না করিয়া গোলাজাত করিল। দেশের ধান্য তাহা হইলে

দেশে থাকিয়া যায়, মূল্যের তারতম্য (Fluctuations of the market) বেশী হয় না এবং অভাবের সময় সকলেই এই গোলাজাত ধান্যের উপস্বত্ব ভোগ করে। আরও প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এরূপ লোক আছে যাহারা প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিবার বৎসরেও দুই তিন মাস ধান্যাভাবে বিশেষ কষ্ট পায়। এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ এই ২।৩ মাস পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য গ্রাম্য মহাজনের নিকট ধান্য বা ধান্য ক্রয় করিবার জন্য টাকা কর্জ লয় এবং "দাদন" লইতেও অনেক সময় বাধ্য হয়। * দরিদ্র কৃষকগণের কি দুর্বিষহ সুদের হার বহন করিতে হয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী জিলার সুদের হার হইতে কতক পরিমাণে বোঝা যাইবে :—

(১) রাজসাহী জিলায় ১ কাঠ ধান্য কর্জ লইলে তিন মাস পরে ৩ কাঠ দিতে হয়।

(২) বর্দ্ধমান জিলায় বিশসের ধান্য কর্জ লইলে ২৫ সের দিতে হয়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাসের শেষ সময় পর্য্যন্ত ধান্য কর্জ লওয়া হয়। যদি চৈত্র মাসের মধ্যে শোধ না দেওয়া হয় তবে পরবর্ত্তী বৎসরে এই ২৫ সের আসলে গণ্য হয়।

(৩) গয়া, মুঙ্গের ইত্যাদি প্রদেশে ২০ সের ধান্য কর্জ লইতে ৩০ সের দিতে হয়।

(৪) বরিশাল জিলায় আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে এক মণ ধান্য কর্জ লইলে দেড় মণ দিতে হয়।

এক্ষণ এই প্রকারের ব্যক্তিগণ যদি মহাজনের নিকট না যাইয়া তাহাদের গ্রামের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ধান্য গোলাজাত করা হইয়াছে সেই গোলা হইতে

---

* এই প্রবন্ধের কয়েকস্থলে "দাদন" শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক পাঠকের নিকট এ শব্দটী একটু নূতন বলিয়া বোধ হইবে। অনেক মহাজন কৃষকদের ফসল জন্মিবার পূর্ব্বেই ফসলের দর ঠিক করিয়া টাকা দাদন (advance) দেয়। বাজার দর দশসের করিয়া হইলেও পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে অনেক সময় কৃষকদের আটসের হিসাবে মহাজনকে ফসল ছাড়িয়া দিতে হয়। নীলকর সাহেবদের দাদনের কথা বোধ হয় অনেকের স্মরণ হইতে পারে।

ধান্য কর্জ্জ লয় এবং মহাজনকে যে সুদ দেয় তদপেক্ষা ন্যূন হারে ধান্য কর্জ্জ পায়, তাহা হইলে দেনদার কৃষকেরও লাভ অধিকন্তু ফসল উৎপন্ন হইলে এই কর্জ্জধান ও সুদ গোলার শোধ দিলে গ্রামের সঞ্চিত ধান্যের পরিমাণও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। ইহাতে আরও একটী সুবিধা হয়। দাদন লইলে প্রায়ই শস্য মহাজনের উৎপীড়নে অসময়ে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয় কিন্তু এই প্রকার গোলা হইতে ধান্য লইলে আর সে ভাবনা বড় করিতে হয় না। উল্লিখিত প্রকারে গ্রামের সমবেত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক ধান্য গোলাজাত করা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধান্য পুনরায় নিজেদের মধ্যেই কর্জ্জ দেওয়াই "ধর্ম্মগোলার" (নামের কথা পরে বলিব) কার্য্য প্রণালী। ধর্ম্মগোলার সঞ্চিত ধান্যের পরিমাণ কয়েক বৎসরে উপরোক্ত প্রকার লেনদেনে এত বর্দ্ধিত হয় যে ভবিষ্যতে কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে গ্রামবাসী সকলেরই ধান্য নষ্ট হইয়া গেলেও এক ধর্ম্মগোলার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর কবল হইতে অনায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। * এতদ্ব্যতীত গ্রাহকতা (Demand) ও সরবরাহতা (Supply)র জন্য বাজার দরও (Fluctuations of the market) ঠিক থাকিলে সকলেই বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে। †

সংক্ষেপে ধর্ম্মগোলার নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় দ্রষ্টব্য।—

(১) স্বস্বগ্রামস্থ লোক দ্বারাই ধর্ম্মগোলা সংস্থাপিত হইতে পারে।

(২) কৃষকগণ যে ধান্য ধর্ম্মগোলাতে সঞ্চিত হইবার জন্য দিবে তাহা নিজ নিজ অংশের স্বল্পাংশ পরিমাণে দিবে এবং তাহাও প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন

---

* Not merely would the Stock of each bank constitute an effective provision against the worst consequences of famine in the village in which it was maintained, but the effect of the scheme in the aggregate would be the perennial retention of a large stock of food that would otherwise have left it and this important end would be achieved without the smallest distress to any one or the least interfrence with the operations of trade.

Statesman—August 17, 1902.

† এই বিষয়টী পূর্ব্বেই বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

হইবার বৎসরেই দিবে সুতরাং কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

(৩) গোলা রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ অবৈতনিকভাবে কার্য্য করিবেন সুতরাং কোন প্রকারেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। *

(৪) পুরাতন ধান্য অনায়াসেই বদলাইয়া লইতে পারা যাইবে। সুতরাং ধান্য নষ্ট হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। †

(৫) দরিদ্র কৃষকগণ সময় মত কম সুদে ধান্য পাইলে দাদনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য বৎসরে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণও ধর্ম্মগোলা হইতে বিশেষ উপকার পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আপনা হইতে জন্মিবে।

(৬) গ্রামের ধান্য গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। গ্রামবাসীগণ স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে। সামাজিক শাসন আইনের স্থান অধিকার করিবে এবং এই প্রকার

---

* ব্যয় সম্বন্ধে এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke) যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। "Thoughts and Details on Scarcity" নামক পুস্তিকায় বার্ক গ্রাম্য গোলার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The keeping them up would be at a great charge The management and attendance would require an Army of Agents, Store keepers, clerks and servants" আমাদের প্রস্তাবিত ধর্ম্মগোলায় গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক অবৈতনিক ভাবেই কার্য্য চলিবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র ব্যয়ও হইবে না।

† উপরোক্ত পুস্তিকায় বার্ক লিখিয়াছেন যে "The decay and corruption of corns would be a dreadful drawback on the whole dealing; and dissatisfaction of the people, at having decayed, tainted or corrupted corn sold to them, as must be the case, would be sreious." আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরাতন ধান্য অনায়াসে যে নূতন ধান্য দিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারা যায় ইহা বার্কের স্মরণ পথে উদিত হয় নাই।

গোলা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হইলে ভবিষ্যতে অনায়াসে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যাইবে। *

অন্যপ্রদেশে ধর্ম্মগোলা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কিনা।

আমরা যে প্রকার গোলার কথা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে ধান্য সঞ্চয়ের কথাই বলিয়া আসিতেছি। ধান্য অর্থে দেশোৎপন্ন মুখ্য দ্রব্য (staple crops) ধরিলেও চলে; কেন না ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিতে পারা যায়। যে সমস্ত ফসল কয়েক বৎসর সঞ্চয়েও কোন প্রকার নষ্ট হয় না সেই সমুদয় প্রকার ফসল দ্বারাই ধর্ম্মগোলা স্থাপন করা যায়। মাদ্রাজ, বম্বে, মধ্যপ্রদেশে এবং উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের কতকাংশ বজরাই প্রধান খাদ্য। বজরা অন্তত ৫ বৎসর ভালরূপে থাকে—কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। সুতরাং এই সব প্রদেশে অনায়াসেই ধর্ম্মগোলা সংস্থাপন করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ, আসাম এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি যে সকল স্থানে ধান্যই প্রধান খাদ্য সেখানে ত কথাই নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের অল্পবিস্তর সকল প্রদেশেই ধর্ম্মগোলা সংস্থাপন করা যাইতে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে। অভাবের সময় যদি কৃষকগণ স্বল্প সুদে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের এবং বীজ বপনের সুবিধা পায় এবং দেশের ধান্য দেশেই থাকিয়া যায় তবে বৎসর বৎসর অনাহারক্লিষ্ট সন্তান সন্ততিদিগের হৃদয়ভেদী চীৎকারে আর দরিদ্র কৃষক

---

* The Gola is managed by the villagers themselves and defaulters are dealt with not by appeals to the law but by social ostracism for such a length of time as the panchayet might decide. There can be no doubt that if no difficulties exist, in the way of the extension to other parts of India the cornbank might do much towards solving the problem of famine in this country."

The Englishman, 17th January, 1902.

পিতামাতার অশ্রুতে ভারতভূমি সিক্ত হইবার সম্ভাবনা ক্রমেই কম হইয়া পড়ে।

প্রবর্ত্তকের পরিচয় এবং গোলার নামকরণ।

বঙ্গবাসীর সুপরিচিত ঢাকা জেলার জমিদার শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ই এই প্রকার গোলার প্রবর্ত্তক। প্রথমতঃ তিনি এই প্রকার গোলার নাম "লক্ষ্মীগোলা" দিতে চাহেন কিন্তু লক্ষ্মী নামে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের আপত্তি হইবার সম্ভাবনায় তিনি ইহার নাম "ধর্ম্মগোলা" দেন। দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ নামক স্থানে প্রথমতঃ তিনি এই বিষয় পরীক্ষা করেন। তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার ঐ স্থানের প্রজাগণ ১০৫।/৯ পাই সংগ্রহ করে এবং এই টাকা দিয়া ৮০ মণ ধান্য ক্রয় করিয়া গোলাজাত করে। ৮ বৎসর মধ্যে এই ৮০ মণ ধান্যের পরিমাণ লেনদেন ১৩৬০ মণে পরিণত হইয়াছে এবং এক্ষণ এইরূপও আশা করা যায় যে আরও কয়েক বৎসরে যে ধান্য গোলায় সঞ্চিত হইবে তাহাতে আশা করা যায় যে গ্রামবাসী-গণ কয়েক বৎসর পরে আকস্মিক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারিবে। এই বৎসরের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের Co-operative credit society র রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে I. C. S. মহোদয় গোলা পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—
"I examine the books of the Gola. With a Capital of 1 pati 15 bish 14 katas the society started in 1300 B. S. and in 12 years the stock has risen to 31 potis 8 bish. The people here fervently believe it to be a safe guard against famine. The large increase of grain in this year of high prices—if not scarcity—confirms this belief. It is great educative factor."
ধর্ম্মগোলা স্থাপনের কি ফল তাহা উপরোক্ত মন্তব্য হইতে কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে।

ধর্ম্মগোলা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এসম্বন্ধে যাঁহারা আরও বেশী জানিতে উৎসুক, তাঁহারা শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর

চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "ধর্ম্মগোলা" নামক পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবেন। দেশের এই দুর্ভিক্ষের দিনে যাহাতে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হয় সে বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি যে উদ্দেশ্যে "পুণ্যের" এই কয়েক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছি এবং পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য্যেরও ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াছি সে উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইবে। *

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

সুকবি হেম্যান্স।

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত বিষয়েরই মধ্যে কবিত্বের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির শোভায়, সুন্দরী মুখশ্রীতে, শিশুর মধুর হাসিতে সর্ব্বত্রই কবিত্ব; আবার জ্যোৎস্নাবিকশিত রজনীতে যেমন মহাকবির কবিত্বের রসাস্বাদন করি তেমনি ঘোর স্তব্ধ অমাবস্যা নিশীথেও একটি মধুর গম্ভীর ভাবে প্রাণ মগ্ন হইয়া যায়। ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ঐ সমুদয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইতে পারেন কিম্বা অতি তুচ্ছ কোনও বস্তুতেও সহস্র গুণ সৌন্দর্য্য দেখিতে পারেন তাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই কবি নহেন। বড় বড় গায়কদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া অনেক শ্রোতারা ঘাড় নাড়িতে এবং তালি দিতে থাকেন কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদিগের সকলকেই গায়ক বলিবে?

---

* We feel a spasmodic pity when an earthquake kills off 20,000 people, in fact every great holocaust calls out the latent benevolence of the rich. But the sight of slow torture does not seem to move the human heart, much on the principle that eels were skinned alive because they do not cry out, so people thought they had got used to it.

The Pioneer—Agricultural Banks—July 27, 1905.

কথনই নহে। সেইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে কিম্বা সেই শোভা উপলব্ধি করিলেই কবি হওয়া যায় না। তবে কবি কে? যিনি যাহা দেখেন ও যাহাতে মুগ্ধ হয়েন যদি তাহা মধুর ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন তবে তিনিই প্রকৃত কবি। আমাদের আলোচ্য এই রমণীও সত্য সত্যই কবি ছিলেন। সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বে অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই রমণী প্রাকৃতিক শোভাব মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিতেন। প্রায়ই তিনি ইংলণ্ডের পর্ব্বতোপরি বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন; বৃক্ষের শর শর শব্দে, কি কোনও পার্ব্বতিয় ক্ষুদ্র নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে মোহিত হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতে থাকিতেন।

লিভারপুল নগরে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে, ২৫শে সেপ্টেম্বরে ডরথি ব্রাউন হিম্যান্স এর জন্ম হয়। ইহার পিতা মিষ্টার ব্রাউণ লিভারপুল নগরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। ইহার মাতা ভিনিস সহরে জন্মগ্রহণ করেন। য়ুরোপের মধ্যে ভিনিস একটী অতিশয় রমণীয় সহর, সেই হেতু হেম্যান্স বলিতেন যে তাঁহার মাতাই তাঁহার কবিতা ও নাটকাদির প্রধান কারণ। হেম্যান্স বাল্যকালে পরমা সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ক্রমে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের অনুরূপ মানসিক সৌন্দর্য্যেও ভূষিত হইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি অতি নম্র প্রকৃতির ছিলেন। একবার একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বালিকা ডরথিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন "এই বালিকা সুখের জন্য জন্মায় নাই; ইহার গণ্ডদেশ অতি ত্বরিতে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে, ত্বরিতেই মিলাইয়া যায়।" সেই অবধি এই কথা তাঁহার হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছিল, তিনি ইহা জীবনে কথনও ভুলিতে পারেন নাই। তের বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কতিপয় কবিতা কোন মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন কিন্তু সেই কবিতাগুলির একটি কঠোর সমালোচনা হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে এতদূর আঘাত লাগিয়াছিল যে নিরতিশয় দুঃখে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডরথি যখন নিতান্ত বালিকা তখন ইহার পিতা ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লিভারপুল হইতে উত্তর ওয়েলস্ প্রদেশের ব্রণউইল্‌ফা নামক এক নির্জ্জন স্থানে উঠিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য তখন তাহাদের পক্ষে লিভারপুল হইতে উঠিয়া যাওয়া অতিশয় কষ্টদায়ক

হইয়াছিল, কিন্তু ডরোথির পক্ষে ইহা যেন "শাপে বর হইল"। তাঁহাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকের পার্ব্বত্য দৃশ্য সকল বালিকা কবির কবিত্ব উৎসারিত করিয়া দিতে লাগিল। হেম্যান্স সাত আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যদিও তখন তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু লিভারপুলে থাকিলে বোধ হয় এত শীঘ্র তাঁহার কবিতার বিকাশ হইত না। সেক্সপিয়রের গ্রন্থ ইঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন—"ইতিহাস পাঠ করিতে আমার বড় ভাল লাগে। জ্ঞানী ও বীরপুরুষদের এবং তাহাদের কর্ম্মসকল স্মরণ করিলে অতীতকালের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়র প্রমুখ কবিদিগের সুললিত রচনা পাঠ করিলে আমার যেরূপ আনন্দ হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না—হৃদয় মাতিয়া উঠে। বেচারী ওফেলিয়ার শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা যেমন চক্ষুর জল না ফেলিয়া থাকিতে পারি না আবার সেইরূপ হরিতবর্ণের বৃক্ষলতাপূর্ণ উপত্যকা মধ্যে শুভ্র জ্যোৎস্না রজনীতে পরীরা নৃত্য করিতেছে সে দৃশ্য যেন মনকে বিমোহিত না করিয়া যায় না।" সাত আট বৎসর বয়সে যে সকল কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন তাহা ঐরূপ অল্প বয়সের পক্ষে খুব ভাল বলিতেই হইবে।

সৌভাগ্য বশতঃ ডরথির মাতা, মিসেস ব্রাউণ কন্যার এই অসামান্য দৈব শক্তি দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহার আরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি মাতার যত্নে ও সাহায্যে উত্তরোত্তর ছন্দ রচনা প্রভৃতিতে উৎকর্ষতা লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "গার্হস্থ্য প্রণয়" নামে যে কবিতা পুস্তকটী প্রকাশ করেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে তাহার প্রায় লক্ষাধিক সংখ্যা বিক্রয় হইয়া যায়। ইহা হইতেই জনসাধারণে তাঁহার কবিতা কতদূর আদৃত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এই পুস্তক বাহির হইবার পর ক্যাপ্টেন হেম্যান্সের সহিত ইঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বিবাহে দম্পতীদ্বয়ের কেহই সুখী হয়েন নাই। কি করিয়াই বা হইবেন! কাপ্তেন সাহেব কঠোর সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিয়া নিজের জীবিকা অনুযায়ী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত, এদিকে কোমল স্বভাবা সুন্দরী

ডরথি ঠিক তাহার বিপরীত, সুতরাং কি করিয়া উভয়ের মনের মিল হইবে? যাহা হউক চারি পাঁচটি পুত্র জন্মিবার পর ইহার স্বামী শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া ইটালী চলিয়া যান এবং মিসেস হেম্যান্স সন্তানগুলিকে লইয়া পুনরায় ওয়েল্‌স্‌দেশে তাঁহার মাতার নিকট চলিয়া আইসেন। সেই অবধি ইহারা বরাবরই ভিন্ন হইয়াই ছিলেন।

কাপ্তেন হেম্যান্স ইটালী চলিয়া গিয়া স্ত্রী পুত্রের কাহারই খোঁজ খবর না লওয়াতে মিসেস হেম্যান্স ছোট ছোট পুত্রসন্তানগুলির ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য অতি কষ্টে পাড়লেন; সুতরাং তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিকপত্র প্রভৃতিতে লিখিতে আরম্ভ করিতে হইল। প্রতি পৃষ্ঠা লেখার জন্য তিনি এক মোহর করিয়া পাইতেন; ইহাতে তাঁহার সংসার বেশ এক রকম চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন হইতে আমোদের পরিবর্ত্তে এই "ঐশ্বরিকদান" তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হইল। বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া ইনি কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করেন নাই। ছোট বেলায় ফ্রেঞ্চ এবং ইটালীয় ভাষা জানিতেন, পরে স্প্যানীয ও পর্ত্তগীজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ ভাষা অল্প অল্প জানিতেন কিন্তু নিজের যত্নে ঐ ভাষাকে এতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি মহাকবি গেটের তেজস্বিতাপূর্ণ ভাষাও বুঝিতে সক্ষম হইতেন।

তাঁহার স্মরণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার তাঁহার এক ভাই, তাঁহার স্মরণশক্তির বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে তিনি বিশপ হীবারের "ইউরোপ" নামক প্রায় চারিশত পংক্তির এক কবিতা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে মুখস্থ করিয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি এ কবিতা একবারও পড়েন নাই। ইহা ব্যতীত তিনি চিত্র কর্ম্মে বেশ পটু ছিলেন। এবং হার্প ও পিয়ানো খুব সুন্দর বাজাইতেন; ইহারা যেন তাঁহার দুই প্রিয় সখী ছিল, এবং ইহাদের সহবাসে তাঁহার দিবসের শ্রান্তি ক্লান্তি সব দূর হইয়া যাইত। বিশপ হীবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, ইঁহারই উৎসাহে তিনি "Vespers of Palermo" নামক শোকপূর্ণ নাটক লিখিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে সফলকাম হয়েন নাই।

হেম্যান্সের কবিতার যশঃ সৌরভ তাঁহার জন্মভূমির ন্যায় আমেরিকাতেও

বিস্তৃত হইয়াছিল। সেখান হইতে একটি মাসিকপত্র চালাইবার জন্য তাঁহার নিকট একটী খুব ভাল কর্ম্মের প্রস্তাব আসে, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া ধন্যবাদের সহিত তিনি তাহা অস্বীকার করেন।

তাঁহার যশঃ সৌরভে যতই দিগন্ত আমোদিত হইতে লাগিল ততই মধু-মক্ষিকার ন্যায় বড় বড় সাহিত্যসেবী দলের মধ্যে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, জেম্‌স মণ্টগমরী, ডাক্তার বাউরিঙ্গ, রস্কো, সার ওয়াল্টার স্কট্, মিসেস হাউইট এবং আরও অনেক খ্যাতনামা লোকের সহিত তাঁহার খুব ভাল রকম আলাপ পরিচয়াদি হইয়াছিল।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রিয়তম ওয়েল্‌সের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া লিভারপুলের নিকটবর্ত্তী একস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার "ওয়েল্‌সের নিকট বিদায়গ্রহণে" তিনি লিখিয়া-ছেন :—

"আমি তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি! তাহা তোমার উপকূলে পার্ব্বত্য দৃশ্যের রমণীয় শোভার জন্য নহে, অথবা পুরাকালে তোমার ক্রোড়ে যে সকল বীর ও খ্যাতনামা কবি পালিত হইয়াছিল তাহাদের অমর স্মৃতির জন্যও নহে, অথবা সেই তোমার গৌরবান্বিত অতীত যুগের গানের জন্যও নহে—কেবল তুমি আমার মাতৃভূমি ও আমার কবিত্ব জীবনের ক্রীড়া ক্ষেত্র বলিয়া।"

তাহার পর বৎসর ডরথি হেম্যান্স স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণে যাইয়া সার ওয়াল্টর স্কটের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহার আগে ইনি কখনও সার ওয়াল্টর স্কটকে দেখেন নাই। ওয়েভালি গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আলাপের পর মিসেস হেম্যান্স, তাঁহার মধুর ও সৌজন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে আমি সার ওয়াল্টর স্কটের সহিত এমন ভাবে কথা কহিতেছিলাম যেন তিনি আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু, যদিও এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কারণ তিনি এই মাত্র তাঁহার বাড়ী অ্যাবটস্ফর্ডে ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত সকালে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি আমায় স্কটলণ্ডে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিলেন তখন আমি তাঁহার সহবাসে একটা প্রখর শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলাম। এডিণবরাতে ফিরিয়া আসিবার জন্য ওয়াল্টর স্কটের নিকট বিদায়গ্রহণ করি-

বার কালে তাঁহাকে এই বলিয়াছিলাম "কোন কোন লোক আছে, যাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই যেন কোন আপনার লোক বলিয়া দাবী করিতে ইচ্ছা করে, তোমাকেও সেই ধরণের একজন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কবি ওয়াডস্‌ওয়ার্থের সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহার সহিত পরিচিত হইলে মিসেস হেম্যান্স বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কোন বন্ধুকে কবি ওয়াডস্‌ওয়ার্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত পরিচিত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইঁহার দয়ালু ভাব আমার হৃদয়ে এক রকম শান্তিদান করিয়াছে। ইঁহার জীবনের দৈনিক সৌন্দর্য্য, তাঁহার কবিতার সংযোগে যে একটি মধুর সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমরা অনেক সময় একত্র থাকি। তিনি আমার নিকট পড়েন, বেড়ান, আবার যখন আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই তিনি ইহার অগ্রে অগ্রে থাকেন। বাস্তবিকই তাহার সহিত যেন আমার বহুকালের পরিচয়। আজ সমস্ত সকালটা তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কাছে স্পেনসরের খানিকটা পড়িয়াছেন, তাহার পর তাঁহার স্বরচিত Laodamia, তাহার পর আমার প্রিয় "টিনটার্ণ অ্যাবী" এবং আরও অনেক ভাল ভাল কবিতা পড়িতেছিলেন যেগুলি তুমিও আমার ন্যায় অত্যন্ত ভালবাস। তাঁহার পড়া একটু মজার রকমের, কিন্তু আমার কানে খুব মধুর লাগে; ধীর, গম্ভীর, এবং পড়িবার কালে তাঁহার এত আগ্রহপূর্ণ ভাব যে আমি আগে কোথাও কখনও এমন পড়া শুনি নাই। যখন তিনি খোলা জায়গায় কিছু পড়েন কি কিছু আবৃত্তি করেন তখন তাঁহার গম্ভীর ও গভীর সুর যেন কোন অমানুষিক স্বর হইতে বাহির হইতেছে মনে হয়। বনের গাছ পালার এবং নির্ঝরিণীর সুরের সহিত তাঁহার স্বরের সংমিশ্রণ বড়ই মনোহর। তাঁহার ভাব আশ্চর্য্য রকম কবিত্বপূর্ণ।" আর একটি চিঠিতে হেম্যান্স লিখিয়াছেন—"কি করিয়া আমি তোমায় বলিব কি প্রকার শান্তি ও পবিত্রতার মধ্যে আমি বেষ্টিত আছি। গত দুই বৎসর হইতে আমি কখন কখনও ভয় পাইয়াছি যে স্তুতিবাক্য, কঠোর সাংসারিক পরীক্ষা, মনের বৃত্তিগুলিকে বেশী রকম মোচড় দেওয়া এবং গুরুতর পরীক্ষা প্রভৃতির ফলে আমার ভিতরকার শুদ্ধ, পবিত্র আনন্দের নির্ঝরিণী বুঝি শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু এখন আমি

জানিলাম,—

'Nature never did betray
The heart that loved her.'

অর্থাৎ "যাহারা প্রকৃতিকে ভালবাসে, প্রকৃতি তাহাদের সহায়" "এখন আমি যেন আব পবিত্র সত্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয় ভাবিতে পারি না। আমি কি ইহার আগে তোমায় কখন বলিয়াছি যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়া আমায় কত আনন্দ প্রদান করে? তাঁহার স্বর যেন জলদগম্ভীর ভাবে উঠে, আর মিলাইয়া যায়। আমরা এইমাত্র গ্রাসমিয়ারে গভীর উপত্যকা হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। অনেক রকমের প্রকৃতির বিষয় কথা হইতে হইতে আমি বলিলাম 'বোধ হয় আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহার চেয়েও কত বেশী গম্ভীর ও বেশী মধুর বাদ্যসঙ্গীত।' তিনি নিম্নলিখিত মহাকবি মিল্টনের দুই পংক্তি শ্লোক আবৃত্ত করিয়া আমার কথার উত্তর দিলেন। তাঁহার গম্ভীর আগ্রহভাব—ভক্তিভাবপূর্ণ গুঞ্জনে মিলাইয়া গেল— যেন ঐ শ্লোকটি হৃদয় থেকে উত্থিত হইল—ওভাব আমি কখনও ভুলিতে পারি না; যখন তাঁহার এই উচ্চ ভাবগুলি ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল তখন মনে হইতেছিল যেন বনের বৃক্ষপত্রগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনায় বিচলিত হইতেছে।"

এই পত্রগুলি হইতেই হেমান্সের হৃদয় কিপ্রকার মধুর কবিত্বপূর্ণ এবং উচ্চ ভাবযুক্ত ছিল তাহা বোঝা যায়। কিছুকাল পরে লিভারপুলের নিকট ওয়েভাট্রি হইতে মিসেস হেম্যান্স পুনরায় আয়ার্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে আসিয়াই খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু একটা বড় দুঃখের বিষয় যে এত অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি তাঁহার পুত্রদের লেখাপড়া প্রভৃতি ব্যয় ভারের জন্য কষ্ট করিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেন। একবার তিনি তাঁহার এক ভাইকে লিখিয়াছিলেন যে "আমার বরাবর এই দুঃখ যে পুত্রদের শিক্ষার জন্য অনিবার্য্য আবশ্যকীয় অর্থের জন্য বাধ্য হইয়া যে সকল বিষয় আমি বৃথা বলিয়া মনে করি এমন সব বিষয়ে আমাকে মনোনিবেশ করিতে হয়। আমার ইচ্ছা হয় যে আমার সমস্ত মানসিক শক্তি কোনও উচ্চ এবং বৃহৎ কর্ম্মে নিয়োজিত করি, এমন কোন মহান এবং পবিত্র

বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি যাহা ভবিষ্যতে একটা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু হায়! বিধাতা বুঝি সে সাধে বাদ সাধিলেন। বিধবার ন্যায় এই পুত্র সন্তানগুলিকে লইয়া এই কঠোর সংসারের সহিত যুঝিয়া তিনি ক্রমেই গম্ভীর, শান্ত ধীর ও ধর্ম্মিষ্ঠা নারী হইয়াছিলেন; এবং বহু দিবস হইতে তিনি ধৈর্য্য, ত্যাগ প্রভৃতি মহদ্‌গুণ সকল অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অন্যান্য গুণের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধটি তাঁহার অতিশয় প্রবল ছিল।

মিসেস হেম্যান্সের কবিতায় যদিও একটা খুব শক্তি ও মৌলিকতা দেখা যায় না কিন্তু ইহাতে বেশ একটি কোমল সুললিত ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার স্কারলেট জ্বর হইলে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। ডব্লিনের আর্চ্চবিশপ তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া নিজের গ্রীষ্মাবাসে লইয়া যান, যদিও তাহাতে একটু হেম্যান্স সুস্থ হন, কিন্তু তাহার গৃহে যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুতরাং আর্চ্চ বিশপ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অপরিসীম যত্নেও তাঁহার কিছুই উপকার করিতে পারিলেন না। ১২ই মে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিন সহরে তিনি এই অসার সংসার ত্যাগ করিয়া যেখানে রোগ শোকের যন্ত্রণা নাই, যেখানে সমস্তই মধুর, সেই শান্তিরাজ্যে গমন করেন।

শ্রীসুষমা দেবী।

সাংখ্যস্বরলিপি।

হে ঈশ্বর।

মেঘমল্লার—সুরফাঁকতাল।

হে ঈশ্বর (ধ্রুঃ)!
হইলাম তোমার শরণাপন্ন
তুমি অন্নদাতা যোগাইছ অন্ন
হে ঈশ্বর (ধ্রুঃ)।
কত সুখ দিয়েছ আমার জন্য
সুখদাতা তুমি ধন্য তুমি ধন্য
হে ঈশ্বর (ধ্রুঃ)!
তব কাছে কব মোর মনস্কার
আনন্দে করি তোমায় নমস্কার।

তালি । ১ঃ (স্থা, স্ত, ভো) । ২ । ৩ ॥
মাত্রা । ৪ । ২ । ৪ ॥

স্থাঃ— মা + মা রে মা । পা২ । পা৪ ।
স্থাঃ— হে — — — । ঈ । শ্বর্ ।

ধা সা(২) ধা পা । পা পা । মা পা মা
হ ই লা —ম্ । তো মা । — — —

গা । গাঁ গাঁ গাঁ২ । গাঁ মা । রে২ সা২ ।
—ব । শ র ণা । — — । প ন্ন ।

রে মা রে মা । মা২ । পা২ পা২ । মা পা
তু মি অ — । ন্ন । দা তা । যো গা

২ ....
নি নি । স্যা২ । সা৪ ॥
ই ছ । অ । ন্ন ॥

ধ্রুঃ মা + মা রে মা । পা২ । পা৪ ।
ধ্রুঃ হে — — — । ঈ । শ্বর্ ।

২.................................
মা পা নি নি । সা সা । সা৪ ।
ক ত সু খ । দি য়ে । ছ ।

....
সা সা রে রে । মৃগা২ । গা২ । গা গা গমা২ ।
অ মা — র । জ । ন্য । সু খ দা ।

....
রে২ । সা সা পা২ । পুনি২ পা পা । মা পা
তা । তু মি ধ । ন্য তু মি । ধ —

মা১/২ গাঁ১/২ মা রে সা ॥ ধ্রুঃ— মা২ রে
স্থ — — — — ॥ ধ্রুঃ— হে —

মা । পা২ । পা৪ । (ভো)ঃ— মা মা
— । ঈ । শ্বর্ । (ভো)ঃ— ত ব

+ মা১/২ রে১/২ মা । পা২ । পা২ পা পা ।
— — — । কা । ছে ক র ।

ধা সা ধা পা । মা১/২ পা১/২ + পা । মা
মো র ম ন । স্কা — — । —

১..
গাঁ৩ । মা পা নি সা । সা২ । সা সা৩ ।
— । ত ব কা — । ছে । ক ব ।

২..
সা১/২ নি১/২ সা রে রে । মগাঁ২ । গাঁ৪ ।
ম —র্ ম ম ন । স্কা । —র্ ।

....

গাঁ২	গ্‌মা২	।	রে২	।	রে	সা৩	।
আ	ন	।	ন্দে	।	ক	রি	।

পা	পা	নিঁ	পা	।	পা২	মা২
তো	মা	—	য়্	।	ন	—

পা	।	মা২	গাঁ২	মা	রে	সা	।
ম	।	স্কা	—	—	—	—র্	।

(ধ্রুঃ):—	মা২	রে	মা	।	পা২	।	পা৪	॥
(ধ্রুঃ):—	হ	—	—	।	ক্ট	।	স্বর্	॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।